বীর সাভারকর

ও

শহীদ ধিংড়া

শ্রীবিশ্ব বিশ্বাস

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
[illegible]

প্রকাশক :
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৫।১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ ।

প্রথম প্রকাশ ঃঃ বৈশাখ, ১৯৫৯

মুদ্রাকর :
শ্রীহরিনারায়ণ দে
শ্রীগোপাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৫।১-এ কালিদাস সিংহ লেন,
কলিকাতা-৯ ।

আকাশবাণীর একখানি দেশপ্রেমের গান—

শত শহীদের রক্ত রাগে

মন্ত্র মোহিনী যে শক্তি জাগে ঃ

ভারতবাসী—বিশেষতঃ বাঙালী জাতি ভাবপ্রবণ জাতি। সংসার-সুখ পরিত্যাগ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য ফাঁসির-মঞ্চে আত্ম-বলিদান সাধারণ মানুষের মনকে যতটা আলোড়িত করে ততটা নেতাদের ভাষণ বা রচনায় সম্ভব হয়নি। মারাঠায় চাপেকার ভাইদের ও বিনায়ক রাণাডের আত্মদান ও বাংলার ক্ষুদিরাম, কানাই ও সত্যেনের আত্মদান বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামের যে স্রষ্টা তা রাজনৈতিক ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই জানেন। অমৃতসরের বীর সন্তান মদনলাল ধিংগরা এই স্রষ্টাদেরই একজন। ধনী রাজভক্ত এরিষ্টোক্র্যাট পরিবারের এই সন্তানটি ভোগলালসার প্রবাহ থেকে মুক্ত হয়ে দেশভক্তির মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন—যখন তার বয়স মাত্র আঠার। বিখ্যাত ধনী পিতা ও ভ্রাতার রাজভক্তির জৌলস অর্ধশতাব্দী ব্যাপী ভারতীয় তরুণের আত্মদানের অবদানে ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে গেছে কবে কিন্তু ধনী রাজভক্ত এরিষ্টোক্র্যাট পরিবারের বিদ্রোহী সন্তান এই ধীংগরা আজ অমর।

এরিষ্টোক্র্যাসি ও বুর্জোয়াইজিমের এই পরিণতি! অসাধু অর্থে তৈরী বিকৃত সাহিত্য ও সংস্কৃতি তাঁদের রক্ষা করতে পারেনি। তাঁদের রক্ত হয়েছে তাঁদেরই রক্তের বিদ্রোহী। ক্ষত্রিয়ের ভোগ-লালসার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন ক্ষাত্রধর্মী শ্রীকৃষ্ণ। য়িহুদী যীশু য়িহুদীর প্রতিক্রিয়াশীল সমাজবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন আর কোরেশী সন্তান হয়েও হজরত মহম্মদ কোরেশী (পুরোহিত) আধি-পত্যের হন বিদ্রোহী।

আজও তাই দেখছি। দেখছি ক্যাপিটালিষ্ট মারোয়ারী রাম মোহন লোহিয়াই ক্যাপিটালিজমের বিরোধী...যেমন দেখেছি বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজভক্তের সন্তান ধীংগরাই দেশভক্ত। ধীংগরা—রাজভক্তির পঙ্কলে প্রস্ফুটিত দেশভক্তির এক সুদর্শন পদ্ম ভোগবিলাস লালসার নর্দমায় যেন এক আকস্মিক অতিথি এক অজগর সর্প, দেশদ্রোহীদের সমাজে স্বদেশিকতার জলন্ত সূর্য, হিরণ্য-কশিপুর ঘরে যেন বিধাতার আশীর্বাদ প্রহ্লাদ, কংসের কারাগারে যেন শ্রীকৃষ্ণ—মুখে বাঁশী, হাতে সুদর্শন চক্র। শ্রীঅরবিন্দ ও বীর সাভারকরের Cult of murder এ নূতন তত্ত্বের ও রূপের প্রযোজক চির অমর শ্রীমদন ধীংগরা।

—শ্রীবিশ্ব

যদি দেশহিত মরণা পড়ে মুঝকো সহস্ত্রোং বারভী।
তো ভী ন মঁ ইস কষ্ট কো নিজ ধ্যান ম' লাউঁ কভী।
হে দেশ, ভারতবর্ষ ম' শত বার মেরা জন্ম হো।
কারণ সদা হো মৃত্যু কা দেশোপকারক কর্ম হো॥

—কাকোরী শহীদ রাম প্রসাদ বিস্মিল :

অর্থাৎ,

দেশহিতে যদি মরণ হয়, মরণ হ'ক শতেক বার,
দেশহিতে যদি কষ্ট হয়, কষ্ট বলে মানব না তার ;
হে দেশ আমার ভারতবর্ষ বার বার হেথা জনম যেন,
দেশহিতকর করমের পর বার বার হেথা মরণ যেন।

—কাকোরী শহীদ রামপ্রসাদ বিস্মিল :

'একমাত্র শহীদের শোণিতে
আদর্শের বীজ উপ্ত হয়।"

—নেতাজী সুভাষ :

॥ এক ॥

'ইণ্ডিয়া হাউস'এ ধীংগরা

[১৯০৬]

১৯০৬ সাল। সমুদ্র-ঘেরা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী লণ্ডন। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী। এরই একটা রাস্তার নাম 'হাইগেট'। এই রাস্তার উপর একখানা বড় বাড়িতে ঝুলছে সাইনবোর্ড। সাইন-বোর্ডে লেখা: ইণ্ডিয়া হাউস।

আঠার বছরের এক তরুণ যুবক একদিন এই বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন। বাড়ির সামনে পায়চারি করছিলেন ঐ



মদনলাল ধিংগরা

বাড়ির একজন বাসিন্দা—তাঁর নাম আয়ার। তিনি বললেন: What do you want? (কি চাও?)

যুবক কম্পিত স্বরে বললেন: I want to do at least

something towards the liberation of my motherland which is in the bondage in the hands of the English. (ইংরাজের হাতে বন্দিনী আমার মাতৃভূমির মুক্তিকল্পে আমি যা হ'ক কিছু করতে চাই।)

Well come up with me (আচ্ছা, আমার সঙ্গে উপরে এসো।)

আয়ার—বি. বি. এস. আয়ার—সংক্ষেপে আয়ার। আয়ারের পিছু পিছু আঠার বছরের সেই কিশোরটি 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন।

ছেলেটির প্রতিটি পদক্ষেপে, দেহের প্রতিটি চলনে বিদ্রোহী শিখের রক্তের ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজ। পাঞ্জাবের এক প্রসিদ্ধ ধনী ডাক্তারের পুত্র এই ছেলেটি। অমৃতসহর থেকে আই, এ, পাশ করে লাহোরে বি, এ, পড়তে গিয়েছিলেন। সর্বত্র ইংরাজী বিদ্যা—অষ্টাদশ বর্ষীয় এই কিশোর তরুণের তা ভাল লাগে নি। কাশ্মীর সেটেলমেণ্ট আপিসে নিলেন চাকরি। তাও ভাল লাগেনি। শুনলেন বিলাতে 'ইণ্ডিয়া হাউস' এর নাম। ইনজিনিয়ারিং পড়ার নাম করে জাহাজের খালাসি হয়ে এসেছেন সবে লণ্ডনে। ইংলিশ চ্যানেলের নীল লোনা জলের আছড়ানিতে কাতরা নগরী লণ্ডনের পথ-ঘাট খুঁজে তিনি বার করলেন 'ইণ্ডিয়া হাউস।'

* * *

আঠার বছর বয়সে কিশোরদের বুকে তোলে এক অব্যক্ত ধ্বনি। সেই ধ্বনির ইসারায় এই শিখ কিশোর স্বদেশ ছেড়ে লণ্ডনের মাটিতে দিয়েছেন পা।

আমাদের বাংলা দেশের এক কিশোর কবি—সুকান্ত ভট্টাচার্য এই আঠার বছর বয়স নিয়ে লিখে রেখে গেছেন কবিতা 'আঠারো বছর বয়স'এ চারটি অবিস্মরণীয় ছত্র :

এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য
বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে,
প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য
সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে।

সুকান্তের এই আঠার বছর বয়সের কিশোর 'ধীংগরা'।

* * *

ইণ্ডিয়া হাউস। সাগর ঘেরা বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী লণ্ডন শহরের 'হাইগেট' রাস্তার উপর অবস্থিত 'ইণ্ডিয়া হাউস'। ইংলিশ চ্যানেলের নীল লোনা জলের আছড়ানিতে কাতরা নগরী লণ্ডনের বুকে এই ভারতীয় প্রতিষ্ঠান বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে (১৯০০-১৯১০) বহন করেছে সাগরপারের বিদেশে ইংরাজের পরাধীন ভারতের মুক্তির জন্য বিপ্লব আন্দোলনের এক অত্যুজ্জ্বল ইতিহাস। যার নায়ক শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা (জন্ম ১৮৫৭ : মৃত্যু, মার্চ ৩০, ১৯৩০—জেনেভা ক্লিনিক)।

শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা (১৮৫৭-১৯৩০)।

সাগর পারে বিদেশে ভারতীয় বিপ্লব আন্দোলনের বিশিষ্ট প্রবর্তক এই শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম মুক্তিযুদ্ধ—সিপাহী বিদ্রোহ ১৮৫৭তে। আর সেই সময়ে শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মার জন্ম।

সিপাহী বিদ্রোহের রক্তসাগরের মধ্যে যাঁর আবির্ভাব তাঁরই হাতে যে ভারতীয় বিপ্লব আন্দোলনের বহির্ভারতীয় কেন্দ্র একদা ভারতের শাসক ইংরাজের রাজধানী লণ্ডনে গড়ে উঠেছিল তা শুধু অভিনব নয়, বিচিত্রও বটে। শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা কচ্ছবাসী বৈশ্য। মন্দ্রাণী গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর বয়স যখন আঠার তখন তাঁর পিতৃবিয়োগ হয় (১৮৭৫) এবং তিনি তখন বোম্বাই-এ গিয়ে এক ধনীর কন্যাকে বিবাহ করেন।

থিয়োজফিষ্ট প্রচারিকা রুশ মহিলা মাডাম ব্লাভাটস্কির শিষ্যত্ব তিনি গ্রহণ করেন। লণ্ডনের বেলিয়লে তারপর অধ্যয়ন এবং বি, এ, পাশ করেন। এরপর তিনি ব্যারিষ্টারি পড়েন। ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন—বঙ্গভঙ্গের (অক্টোবর ১৬, ১৯০৫) নায়ক এই সময় তাঁর সহপাঠী ছিলেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে এসে তিনি মধ্য প্রদেশের রুটন রাজ্যের দেওয়ান হন। তারপর হন আজমীরের ব্যারিষ্টার। তারপর কাথিওয়াড়ে জুনাগড়ের দেওয়ান হন।


শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা

উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি (১৮৯৮-৯৯) তিনি বিলাতে গিয়ে ডিমের ব্যবসা স্থুরু করেন। আর অকস্‌ফোর্ডে পড়ান সংস্কৃত মারাঠি ও গুজরাটি ভাষা। এই সময় তিনি লণ্ডনপ্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং নিজ অর্থব্যয়ে এই 'ইণ্ডিয়া হাউস' এর স্থাপনা করেন।

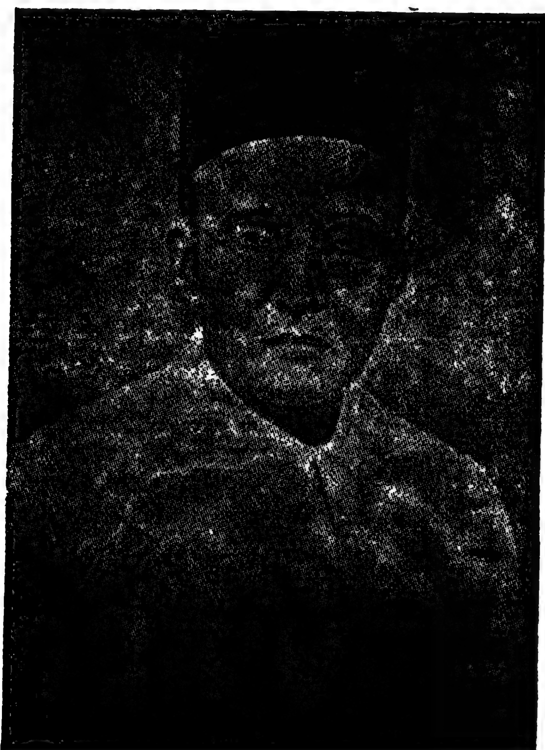
'ইণ্ডিয়া হাউস' মূলতঃ লণ্ডন প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের আবাসিক হোটেল কিন্তু কার্যতঃ সাগরপারে বিদেশে ইংরাজের পরাধীন ভারতের মুক্তির জন্য বিপ্লব আন্দোলনের কেন্দ্র।

স্বামী দয়ানন্দের ভক্ত শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা লণ্ডনের হোমরুল লীগের ছিলেন সভাপতি (১৯০৫) এবং ইণ্ডিয়ান সোস্যালিষ্ট নামক এক পেনি মূল্যের একটি পত্রিকা বার করেন। 'ইণ্ডিয়া হাউস' এর তত্ত্বাবধানের ভার অর্পন করেন টেম্পলইন-এর ব্যারিষ্টারি ছাত্র

মারাঠি যুবক বিনায়ক দামোদর সাভারকরের উপর—তারপর প্যারিসে গিয়ে খুললেন বিপ্লব-আন্দোলনের আর একটি কেন্দ্র। বিনায়ক দামোদর সাভারকরেব জীবন বহুল বৈচিত্র্যপূর্ণ।

*   *   *

বিনায়ক দামোদর সাভারকর (মে ২৮, ১৮৮৫—ফেব্রুয়ারি ২৬, ১৯৬৬): সংক্ষেপে অভিহিত বীর সাভারকর। মহারাষ্ট্র প্রদেশের



বীর সাঁভারকর

নাসিক জেলার দেবলালীর নিকটবর্তী ভাগুর নামক গ্রামে তাঁর জন্ম। এরা তিন ভাই:

প্রথম : গণেশ দামোদর সাভারকর (জুন ২৩, ১৮৮৩-মে ১৬, ১৯৪৫)

দ্বিতীয় : বিনায়ক দামোদর সাভারকর (মে ২৮, ১৮৮৫- ফেব্রুয়ারী ২৬, ১৯৬৬)

কনিষ্ঠ : ডাঃ নারায়ণ দামোদর সাভারকর (মে ২৫, ১৮৮৮- অক্টোবর ১৯, ১৯৪৯)

বীর সাভারকর ১৯০৫ সালে বি. এ. পাশ করে আইন পাঠে উদ্যোগী হন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে মহারাষ্ট্রে বিপ্লব আন্দোলনের সুরু হয়। প্রেরণা-গুরু পরমহংস অগম্য গুরুর নির্দেশে মিত্রমেলা সমিতির মাধ্যমে বীর সাভারকর বিপ্লবাত্মক কার্যে লিপ্ত হন। তিনি পুণার চাপেকার তিন শহীদ ভাই-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। এর পূর্বে এখানে ছিল বিপ্লবী সংস্থা—তরুণ ভারত সভা। মিত্রমেলা পরবর্তীকালে নিউ ইণ্ডিয়া সোসাইটি বা অভিনব ভারত মণ্ডলী নামে রূপান্তরিত হয় এবং লণ্ডন ও ফ্রান্সে প্রসারিত হয়।

ব্যারিষ্টারি পড়বার জন্য সাভারকর লণ্ডনে যান এবং শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মার ছাত্র বৃত্তি নিয়ে 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এ প্রবেশ লাভ করেন।

শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা সাভারকরের উপর 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর তত্ত্বাবধানের ভার দিয়ে প্যারিসে চলে যান। সাভারকর 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এ নিউ ইণ্ডিয়া সোসাইটি বা অভিনব ভারতমণ্ডলী প্রসারিত করেন। বীর সাভারকরের তত্ত্বাবধানে 'ইণ্ডিয়া হাউস' সাগর পারে ভারতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনের কেন্দ্রস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

॥ দুই ॥

সাভারকরের নিকট ধীংগরা

[১৯০৬]

'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর তত্ত্বাবধায়ক বিনায়ক দামোদর সাভারকরের কক্ষ। আয়ারের সাথে সেখানে এলেন ধীংগরা।

'নাম ?' প্রশ্ন করলেন সাভারকর।

ধীংগরা উত্তর দিলেন—আমার নাম মনন লাল ধীংগরা।

দেশ ?

'পাঞ্জাব……অমৃতসর।'

সাভারকর আবার প্রশ্ন করলেন—বাড়িতে কে আছেন ?'

ধীংগরা উত্তর দিলেন—সকলেই আছেন। বাবা বড় ডাক্তার। ভাইরাও কৃতবিদ্য, সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত—কিন্তু……

'কিন্তু কি ?' প্রশ্ন করলেন সাভারকর।

ধীংগরা বললেন—তাঁরা রাজভক্ত। রাজভক্তির প্রসাদে তাঁরা নামে ও ভোগে সমাজে অগ্রণী। আমার তা ভাল লাগে না। আমি চাই দেশহিতে আত্মদান।

সাভারকর নীরবে আয়ারের মুখের পানে চেয়ে থাকেন। ধীংগরা বলেন—অমৃতসর থেকে আই, এ পাশ করে লাহোরে বি. এ. পড়তে গেলাম। শিক্ষালয়েও সেই একই কথা—ইংরাজ-ভক্তি আর ইংরাজী ভাষা। আমার ভাল লাগল না। যারা আমাদের দেশকে আমাদের অনৈক্য ও অজ্ঞতার সুযোগে ছলে বলে কৌশলে দখল করেছে এবং মধ্যবিত্ত জমিদার, স্বার্থবাদী দালাল ও অন্নহীন দেশীয় পাইক পুলিশ মারফত আমাদের দেশ ভারতকে শোষণ করছে তাদের উপর ভক্তি ও আনুগত্য রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব।

একটু নীরব থেকে ধীংগরা আবার বলেন—অর্থ ও অন্ন উপায়ের পথ চাকৃরি। সেখানেও ঐ একই কথা—রাজভক্তি। রাজা ইংরেজ, ইংরাজকে ভক্তি কর। কাশ্মীর সেটেলমেণ্ট আপিসের চাকরি ছেড়ে জাহাজের খালাসি হয়ে ইনজিনিয়ারিং পড়বার জন্য লণ্ডনে এলাম। দেশভক্তদের আড্ডা আপনাদের 'ইণ্ডিয়া হাউস।' তাই এখানে এলাম।

সাভারকর বললেন—বেশ! তুমি এখানে কি চাও?

'দেশভক্তি অনুশীলন ও দেশের জন্য আত্মদানের সুযোগ চাই।' উত্তরে বললেন ধীংগরা।

সাভারকর বললেন—তাই হবে কিন্তু তুমি যে উপরের আস্তরণ দেখছ' তার তলায় কি আছে জানো!

'না'!

'ধিকি ধিকি জ্বলছে আগুন।'

ধীংগরা ভাবছেন—আনমনা তিনি।

সাভারকর বললেন—পাঞ্জাবে 'গদর পার্টি'র নাম শুনেছ!

'হ্যাঁ!'

'মারাঠায় আমরা গড়েছি আর এক গদর—অভিনব ভারত-মণ্ডলী বা New India society যার নাম আগে ছিল 'মিত্রমেলা'। নাসিক আমাদের কেন্দ্র। আমাদের প্রেরণাগুরু পরম হংস অগমা গুরু…আমাদের আদর্শ পুনার তিন চাপেকার ভাই ও বিনায়ক রানাডে। এঁদের কথা জানো?

'না।'

সাভারকর বললেন—'অসি-যুদ্ধের আগে মসী-যুদ্ধ। এখন আহারাদি কর, বিশ্রাম কর। তারপর আমাদের লাইব্রেরীতে গিয়ে বই পড়। আমাদের অন্য বই নেই। দেশে দেশে যুগে যুগে যাঁরা দেশ-মাতৃকার পায়ের তলায় আত্মদান করেছেন তাঁদের জীবনী

পাবে এখানে। তোমার মত একজন তরুণের আবির্ভাব আমরা অনুভব করছিলাম। আয়ারের সঙ্গে যাও। আয়ারের উপর তোমার ভার। সেই তোমার সব ব্যবস্থা করবে।'

আয়ারের পিছু পিছু বার হচ্ছেন আঠার বছরের তাজা টাটকা ছেলে ধীংগরা। এমন সময় এক কাপ চা নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন 'ঝুঁটি বাঁধা উড়িয়া ব্রাহ্মণ'—নাম চতুর্ভুজ আমিন।

চতুর্ভুজকে চিনলেন না?

ইনি 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর পাচক। সাভারকরের বৈপ্লবিক সংস্থা 'অভিনব ভারত মণ্ডলী'র দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের বিপ্লব আন্দোলনে (১৯০৮-১০) এঁর ছিল বিশেষ এক ভূমিকা।

শুনবেন,—পরে!

॥ *তিন* ॥

'ইণ্ডিয়া হাউস' এর সদস্যা মাডাম কামা কর্তৃক ভারতের প্রথম জাতীয় পতাকা উদ্ভাবন

[১৯০৭]

ইংরাজী শিক্ষার উগ্র প্রভাবে যাঁরা একদিন হাতে নিয়েছিলেন মদের বোতল ও গোমাংস, ভুলেছিলেন নিজের দেশ, ধর্ম ও সভ্যতা, শিখেছিলেন আচারে, ধর্মে, পোষাকে সাহেবিয়ানা তাঁদেরই অগ্রণী প্রখ্যাতনামা শিক্ষক রাজনারায়ণ বসু বার্ধক্য দশায় অনুধাবন করলেন ভ্রান্ত পথ থেকে প্রত্যাবর্তনের ডাক। নবগোপাল মিত্রের সাথে তিনি নামলেন স্বাদেশিকতা প্রচারে। ১৮৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দে চৈত্রসংক্রান্তির দিন তাঁরা হিন্দুমেলার অনুষ্ঠান করেন। হিন্দুমেলা স্বদেশী ভাবোদ্দীপক মেলা।

রাজা রামমোহন রায়ের নিষ্প্রভ ব্রাহ্মধর্মের শিখা আবার জ্বলে উঠল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তদীয় সুযোগ্য সহচর কেশব সেনের কর্মে। শিক্ষা, সমাজসংস্কার, নারীজাগরণ, একজাতীয়তা দিকে দিকে ব্রাহ্মরা প্রচার করেন। সেদিন সুরু হয় দেশপ্রেমাত্মক কর্মযুগের সূচনা।

এ যুগের নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকনাথ গাঙ্গুলী, আনন্দমোহন বসু, মনমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রখ্যাত বক্তা বিপিন পাল ও বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ মহেন্দ্র সরকার। তাঁরা স্থাপনা করেন 'ভারত সভা' নামক একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

'ভারত সভা' সর্বভারতীয় আন্দোলনের প্রথম রূপ। 'ভারত সভা'র আদর্শ পূর্ণস্বাধীনতা। সরকারের সহিত অসহযোগ নীতি ছিল এর পরিকল্পনা।

'ভারত সভা'র নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী স্বয়ং সরকারী চাকরিতে ইস্তফা দেন এবং অন্যান্য কেহই সরকারী চাকরি গ্রহণ করেন নি।

কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করে ১৯৩০ সনে। ১৯২১ সনে সুরু করে অসহযোগ আন্দোলন। তার বহু বছর আগে বাঙালীর প্রতিষ্ঠান এসব চিন্তা করেছিল। তাই গোখলে একদা বলেছিলেন—'বাঙালী আজ যা ভাবে বাকি ভারত ভাবে তা কাল।'

বাঙালী প্রথম ভেবেছে আরও একটা জিনিষ সেদিন—কৃষক ও মজুর:আন্দোলন। কৃষক আন্দোলন—নীলবিদ্রোহ…মজুর আন্দোলন—চা বাগিচার কুলীদের বিক্ষোভ।

তারপর দক্ষিণ ভারতের দুর্ভিক্ষের সাহায্যের টাকা ইংরাজ আফগান যুদ্ধে ব্যয় করায় সারা ভারত হল বিক্ষুব্ধ। এর উপর সংবাদপত্র দমন আইন, আর্মিস অ্যাক্ট, ইলবাট বিল, নেতা সুরেন্দ্র-নাথের কারাদণ্ড। বিক্ষোভে ফেটে পড়ল ভারত। কলকাতায় বসল 'ভারত সভা'র সর্বভারতীয় সম্মেলন—বড়দিন ১৮৮৩।

সর্বভারতীয় এই সংগঠনে ভয় পেল ইংরাজ। ইংরাজদের নেতা হিউম সাহেবের পাল্টা সম্মেলন 'কংগ্রেস' এর দ্বিতীয় সম্মেলন বসল বোম্বাই-এ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের বড়দিনে। বাঙালী ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে। জন্ম নিল কংগ্রেস।

কংগ্রেসের সেদিন পাতাকা কি ছিল বলুন ত'।

ইউনিয়ন জ্যাক।

হাসছেন। হাসবারই কথা।

* * *

ভারতের পক্ষে এটা লজ্জার কথা। মর্মাহতা পার্শীমহিলা… সাগর পারে ভারতীয় বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে নিযুক্তা প্রথমা নারী মহীয়সী বিপ্লবিণী মাডাম কামা ভারতের নিজস্ব একটি জাতীয় পতাকার প্রথম উদ্ভাবন করেন।

'ইণ্ডিয়া হাউস'এর অন্যতমা সদস্যা মাডাম কামা ভারতীয় বিপ্লববাদের আদিযুগের সাগর পারে প্রচার করেন ভারতের স্বাধীনতার সকল্প ও সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শ। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে নিবেদিতা এই নারীর নাম বর্তমান ভারতের তরুণ-তরুণীর কাছে হয়ত অজ্ঞাত কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার জন্য এই নারীর কর্ম, ভাবনাও ত্যাগ আজও স্মরণীয়।

মাদাম কামা (সেপ্টেম্বর ২৪, ১৮৬১—আগষ্ট ১২, ১৯৩৬)

পুরা নাম মাডাম ভিক্কা জি রুস্তম—বিবাহান্তে কামা। বোম্বাই-এর এক ধনী বণিক মিঃ কে. আর. কামার সাথে তাঁর



মাদাম কামা

বিবাহ হয়। সুখী, ভোগীও নিরুদ্বিগ্ন জীবনযাত্রার মধ্যে থেকেও এই ধনী মহিলা জীবনের মধ্য ভাগে মাতৃভূমির মুক্তিসাধনায় সীমাহীন ত্যাগ, কষ্ট ও শ্রম বরণ করেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতরণ এই ধনী মহিলার জীবনে এক আকস্মিক ঘটনা। শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে যান এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী ও আমেরিকায় পরিভ্রমণ করেন। ইউরোপে অবস্থান কালে তিনি প্রগতিশীল ও

স্বাধীনতাকামী প্রবাসী ভারতীয়দের সংস্পর্শে আসেন এবং বিশেষ করে লণ্ডনস্থ 'ইণ্ডিয়া হাউস'এর প্রতিষ্ঠাতা শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা ও তাঁর 'ইণ্ডিয়া হাউস'এর সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ হয়।

১৯০৫ সনের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সুরু হয় বাংলায় স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা। সাগরপারে প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যেও বিখ্যাত বিপ্লবী শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা ও বিনায়ক দামোদর সাভারকর (বীর সাভারকর) এর চেষ্টায় জাগে বৈপ্লবিক কর্মচাঞ্চল্য। যার সাথে যুক্ত হন প্রথম একজন নারী—মহীয়সী বিপ্লবিণী মাডাম কামা।

যৌবন অতিক্রান্ত হলেও তিনি ভয় করলেন না সাগরপারের কারাগার। প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সাথে সাগরপারে ভারতীয় বিপ্লবান্দোলনে তিনি যুক্ত হলেন। ভারত থেকে সাগরপারে আগত ভারতীয় যুবকদের রাজনৈতিক কার্যে সহায়তা করবার উদ্দেশে তিনি মাসিক এক হাজার টাকার বৃত্তি ঘোষণা করলেন এবং আয়ার্ল্যাণ্ড, জার্মানী, রাশিয়া ও মিশরের স্বদেশ প্রেমিকদের সাথে সংযোগ স্থাপন করলেন।

১৯০৭ সাল। জর্মানীর স্ট্যুটগার্ট সহরে বসল প্রথম আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী সম্মেলন। এ সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন মাডাম কামা। এ যাবত ভারতের নিজস্ব জাতীয় পতাকা ছিল না।

প্রতি বছর—১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে—বড়দিনে বসত কংগ্রেসের অধিবেশন। সেখানে ভারতের কোন নিজস্ব পতাকা থাকত' না। কংগ্রেসের অধিবেশনে উড়ত ইউনিয়ন জ্যাক। লজ্জার কথা। মর্মাহতা মাডাম কামা ভারতের জন্য একটি জাতীয় পতাকার কথা চিন্তা করলেন।

বাংলার বোমার আদিস্রষ্টা মেদিনীপুরের বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো (মতান্তরে দাশ) তখন জার্মানে বোমার ফরমূলা সংগ্রহের জন্য বাস করছিলেন। তিনি মাডাম কামার উদ্ভাবিত ভারতীয় জাতীয় পতাকার রূপরেখা নির্ণয় করলেন—তেরঙা জাতীয় পতাকা··· তিনটি রং। সবুজ, হলদে, লাল—মাঝখানে লেখা 'বন্দেমাতরম'।

জার্মানীর স্টুাগার্ট সহরে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী সম্মেলনে (১৯০৭) ভারতের এই প্রথম জাতীয় পতাকা ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে উত্তোলন করলেন মাডাম কামা।

'ইণ্ডিয়া হাউস'এ ধীংগরা একান্তে বসে পড়ছেন সংবাদপত্র—শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মার এক পেনী মূল্যের সস্তা, সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার সামিল সংবাদপত্র Indian Socialist (ইণ্ডিয়ান সোস্যালিষ্ট)। এই সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়েছে স্ট্যুটগার্ট (জার্মান) এ প্রথম আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী সম্মেলনে প্রদত্ত ভারতের প্রতিনিধি মাডাম কামার অভিভাষণ। যার প্রতিটি শব্দের দরদভরা ঝঙ্কারে ভারতের শতকরা নব্বইটি দরিদ্র; মূর্খ মানুষের শিক্ষাহীনতার কালিমা এবং বৃটিশ সরকারের আমলা ও পুলিশের নির্মম পীড়নে ও বৃটিশ সরকারের দালাল জমিদার, মহাজন ও প্রভাবশালী ব্যক্তির বিচারহীন অনাচারী নির্যাতনের কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। ধীংগরা বিদেশী সরকার ও স্বদেশী স্বার্থবাদীদের হাতে লাঞ্ছিত সোনার ভারতের একজন তরুণ সন্তান—তিনি কি সহ্য করতে পারেন ভারতবাসী কোটি কোটি ভাই-দের উপর এই পাশবিক নিষ্পেষণ।

'ইণ্ডিয়া হাউস'এ তাঁর কক্ষের দেওয়ালে টাঙানো মাডাম কামার ফটোর পানে তাকিয়ে ধীংগরা নিলেন শপথ :

'পঞ্চনদের বীর রক্ত আমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত। তার প্রতিটি বিন্দু, ভারতমাতা, তোমার কোটি কোটি বঞ্চিত

শোষিত সন্তানদের জন্য।'

কোটি কোটি বঞ্চিত শোষিত ভারতবাসীর মুক্তির জন্য নিবেদিত মাডাম কামার মুখখানি ফটোয় কাঁচের তলায় হাসছে যেন।

হাঁ। মাডাম কামা।

তাঁর পরবর্তী জীবন আরও কর্মবহুল, আরও ত্যাগ দুঃখকষ্ট নিপীড়ন মণ্ডিত—আরও-বিদ্রোহী।

* * *

বিলাতের পার্লামেন্টীয় নির্বাচনের হুজুগ। বিখ্যাত ভারতীয় রাজনৈতিক নেতা দাদাভাই নওরোজী প্রার্থী দাঁড়ালে মাডাম কামা তাঁর পক্ষে প্রচার কার্যে নামলেন। পরে তিনি ১৯০৭ সনের শেষাশেষি আমেরিকায় যান এবং ২৮শে অক্টোবর তারিখে এক মহতী জনসভায় পরাধীন ভারতের সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী ব্যক্ত করেন।

১৯০৮ সনে তিনি পুনরায় লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন করেন। এর পর থেকে বৃটিশ গুপ্তচর তাঁর পিছু নেয়। ১৯০৫-৬ সনের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও বাংলার বিপ্লববাদ—প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরামের আত্মদান ও আলিপুর বোমার মামলা মাডাম কামাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং ১৯০৯ সনে তিনি শ্রীঅরবিন্দের ইংরাজী পত্রিকা 'বন্দেমাতরম' এর পুনঃ প্রকাশ সাগর পার থেকে সুরু করেন।

এই সমসময়ে জার-শাসিত রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত লেখক গোর্কির সাহিত্য মাডাম কামার অন্তরে আনে নূতন প্রেরণা। গোর্কির কাছে তিনি ভারতীয় সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় পুস্তকাদি প্রেরণ করেন এবং পত্রের মাধ্যমে গোর্কির সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে কামা পত্রের মাধ্যমে গোর্কিকে অবহিত করেন। গোর্কি ভারতের প্রতি জানান তাঁর শ্রদ্ধা।

১ স্টুটগার্ট (জার্মান) শহরে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার অভিযোগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে বৃটিশ সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করেন এবং যুদ্ধশেষে তিনি মুক্তি পান। মুক্তির পর তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুকূলে ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচারকার্য চালাবার জন্য আজীবন সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করেন।

অক্লান্ত পরিশ্রম, কারা নির্যাতন ও পরাধীন ভারতের মুক্তির ভাবনায় প্রৌঢ়জীবনে তাঁর স্বাস্থ্য একেবার ভেঙে পড়ে এবং ১৯৩৬ সালে অসুস্থ শরীরে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

সাগরপারে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুকূলে প্রচার কার্যে দেহের শক্তি ও অর্থসম্বল নিঃশেষে ব্যয় করে অবশেষে বোম্বাই-এর জেনারেল হাসপাতালে ১৯৩৬ সনের ১২ই আগষ্ট তারিখে তিনি পঁচাত্তর বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। সেদিন এই দেশপ্রেমিকা মহীয়সী নারীর শিয়রে ছিলেন তাঁর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাত্র। আর কেউ ছিলেন না।

হাসপাতালে এই মৃতার শিয়রে জনসমাগম হয় নি. শবমিছিল বার হয় নি, ফুলের তোড়ায় ভরে যায় নি কামার শবদেহ। মানুষের স্মৃতি অস্থির, চঞ্চল, বিশ্বাসহীন।

সেদিন এই ভারত সহজেই ভুলে গেল এক ধনী বিদুষী নারীর পরাধীন ভারতের জন্য অসীম নির্যাতন ও কষ্ট ভোগ এবং অকাতরে সর্বস্ব ত্যাগের কাহিনী। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ক্ষুদ্র এক টুকরো মৃত্যু সংবাদ বার হ'ল মাত্র।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য নিবেদিতপ্রাণা মহিলার কথা ভুলে গেল ভারত। ভুলে আছে আজও। নব্য ভারতবাসীর সম্মুখে এখন যে ভোগলালসার ঘোড়দৌড়—আদর্শ যেন তেন প্রকারেণ অর্থের মৃগয়া। ধন্য···ধন্য।

॥ চার ॥

'ইণ্ডিয়া হাউস'-এ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব

[১৯০৭—মে ১০]

১৮৫৭ সালে অনুষ্ঠিত ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামকে ইংরাজরা বিদ্বেষবশতঃ 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে আখ্যায়িত করেন এবং পাখীর পড়া বুলির মত আমরা ভারতবাসীরা তাই সাহিত্যে ও ইতিহাসে ব্যবহার করছি, মুখে উচ্চারণ করছি।

১৯০৭ সালের ১০ই মে লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এ ১৮৫৭ সালের গোরা ভারতীয়দের যুদ্ধের পঞ্চাশ বৎসর পুর্তি উপলক্ষে দামোদর বিনায়ক সাভারকর (বীর সাভারকর) উক্ত যুদ্ধকে 'সিপাহী বিদ্রোহ' আখ্যাদানের প্রতিবাদ করেন এবং একে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম নামে আখ্যায়িত করতঃ এর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন করেন।

উৎসবেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। বীর সাভারকর তখন মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়স্ক যুবক। প্রচুর উৎসাহ ও অধ্যবসায় নিয়ে ১৮৫৭ সালের গোরা-ভারতীয়দের যুদ্ধ ঘটনার ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করতঃ রচনা করেন ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের বিখ্যাত ইতিহাস।

মারাঠী ভাষায় বই লিখে বীর সাভারকর ছাপাবার জন্য ভারতে পাঠান কিন্তু মারাঠী প্রেসে ছাপানো সম্ভব না হওয়ায় পাণ্ডুলিপি তাঁর কাছে ফেরত পাঠানো হয়। বীর সাভারকর এতে দমে না গিয়ে মারাঠী পাণ্ডু লিপিকে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন।

ইংরাজীতে লেখা বীর সাভারকরের ভারতের প্রথম স্বাধীনতা

সংগ্রামের ইতিহাস ইংল্যাণ্ডের প্রেসে অবশেষে ছাপা হয়। বৃটিশ সরকার এই বই বাজেয়াপ্ত করে এবং ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে।

ছাপা শেষ হবার আগে বীর সাভারকরের ইংরাজী পাণ্ডুলিপির কয়েকটি অধ্যায় বৃটিশ গুপ্তচর বিভাগ হস্তগত করায় ইণ্ডিয়া হাউসের অন্যতম সদস্য আয়ার মারাঠি পাণ্ডুলিপি থেকে উক্ত অধ্যায়গুলো পুনরায় অনুবাদ করেন এবং 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এ বীর সাভারকর কর্তৃক স্থাপিত বৈপ্লবিক সংস্থা 'অভিনব ভারত ক্রান্তিকারী সঙ্ঘ'-এর প্রকাশনার ব্যবস্থা করেন।

বৃটিশ গুপ্তচর বিভাগ এই ইংরাজী পাণ্ডুলিপির সন্ধানে তৎপর হয় এবং বৃটিশ সরকার এর প্রকাশনা আইনের বলে নিষিদ্ধ করেন।

বৃটিশ সরকারের এত বাধা সত্ত্বেও বীর সাভারকরের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইংরাজী বই ভারতে প্রবেশ করে এবং ভারতীয় সৈন্যদের কাছে এক এক কপি তিনশ' টাকা পর্যন্ত মূল্যে বিক্রীত হয়।

তখনকার দিনের তিনশ' টাকা এখনকার দিনে কত টাকা হয় হিসাব করুন। বুঝুন—কি ব্যাপার!

এই বই-এর জন্য ভারতে বৃটিশ গুপ্তচরদের ছুটাছুটি সুরু হয় এবং হাজার হাজার লোককে গ্রেপ্তার করে এই বই হস্তগত করা হয়। বীর সাভারকরের বই পড়ে ভারতীয় যুবকরা সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী হন।

এ সময় দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে একদল প্রতিনিধি নিয়ে গান্ধীজি বিলাতে এলে বীর সাভারকর তাঁর সাথে দেখা করেন কিন্তু গান্ধীজি বীর সাভারকরের সশস্ত্র বিপ্লব-নীতিতে সায় দিতে নারাজ হন।

• প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে বীর সাভারকরের ইংরাজীতে লেখা

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের এই চাঞ্চল্যকর মূল্যবান নিষিদ্ধ বই-এর গোপন প্রকাশনা বার করেন পরবর্তীকালে শহীদ সরদার ভগত সিং এবং চির অমর মুক্তিযোদ্ধা সুভাষচন্দ্র।

আমাদের মতে বীর সাভারকরের এই যুগান্তকারী পুস্তকের পুনঃ প্রকাশনা করা বর্তমান স্বাধীন ভারত সরকারের উচিত।

লণ্ডনে ইংরাজদের সিপাহীবিদ্রোহের বিজয়প্রাপ্তি দিবস পালন :

[১লা মে, ১৯০৭]

১৯০৭ সনের ১০ই মে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠান এবং উক্ত সংগ্রামের ইতিহাস রচনায় এত প্রেরণা পঁচিশ বছরের যুবক বীর সাভারকর পেলেন কেন?

সে কাহিনী ভারতীয়দের প্রতি বিদ্বেষী ও শত্রুভাবাপন্ন ইংরাজদের নীচ মনোবৃত্তির পরিচয়ের কাহিনী। সেই কথা এখন বলছি।

লণ্ডনে ইংরাজরা পালন করেন তথাকথিত সিপাহীবিদ্রোহের বিজয় প্রাপ্তি দিবস—১লা মে, ১৯০৭। এই অনুষ্ঠানে তাঁরা একটি নাটিকা অভিনয় করেন। যার প্রথম প্রতিপাদ্য বিষয় হল ভারতের প্রথম রাষ্ট্রীয় সাতন্ত্র সংগ্রামের নায়িকা রাণী লক্ষ্মীবাই ও অমর বীর নানা সাহেবের সম্বন্ধের প্রতি·হীন কলুষিত ইঙ্গিত।

'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর বাসিন্দা ভারতীয় তরুণরা ইংরাজদের এই হীন দুষ্ট প্রচারে ক্ষুব্ধ হলেন এবং এর সমুচিত প্রত্যুত্তর দিবার জন্য সাভারকর কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয় 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব ১০ই মে, ১৯০৭ এবং রচনা করলেন ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাস।

হাঁ। প্রকৃত ইতিহাস। এই ইতিহাসকে বিকৃত করেছে ঐ হীন মনোবৃত্তি-সম্পন্ন ইংরাজ—যাদের পূর্বপুরুষ ইংলণ্ডের দ্বীপের বাপে-তাড়ানো, মায়ে-খেদানো কতকগুলো মানুষ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তৈরী করে আমাদের দুর্বল রাষ্ট্রশক্তি, প্রাদেশিক অনৈক্য এবং আমাদের সাধারণ মানুষদের আর্থিক দুর্গতির সুযোগে ভারত জয় সম্পূর্ণ করেছিল।

কোন শ্রেণীর লোক ভারত যাত্রায় এসে ভারত জয় করেছিল তা বীরনারী লক্ষ্মীবাই ও অমর বীর নানা সাহেবের প্রতি হীন ইঙ্গিতেই প্রকাশ পায়।

ভারতপ্রেমিক ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফিরিঙ্গি বণিক'-এ এ সম্বন্ধে যা লিখিছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন—

…যাহারা রাজদণ্ডে দণ্ডিত, লোকালয়ে লাঞ্ছিত, কুকার্যপরায়ণ বলিয়া স্বদেশে সর্বত্র ধিকৃত, চরিত্রহীনতায় পশুর ন্যায় অবনতি প্রাপ্ত, —সেই শ্রেণীর নামগোত্র-হীন নরাকার রাক্ষসগণই ভারত যাত্রায় বহির্গত হইত।

১৮৫৭ সাল। সেদিন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে অধিকার-চ্যুত রাজরাজড়া ও শোষিত প্রজাদের আর্তনাদের সাথে মিশল দেশীয় সিপাইদের লাঞ্ছনা।

এরই একশ' বছর আগে ২৩শে জুন অনুষ্ঠিত পলাশীর আম্র-কুঞ্জের বিশ্বাসঘাতকতা, দালালী ও অনৈক্যের ভুল শোধরাবার জন্য সকলের প্রাণে দৃঢ়সঙ্কল্প।

কলকাতা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত ফাঁকা মাঠ—গোরা সৈন্য সেখানে অনুপস্থিত, শুধু দেশীয় সৈন্য।

দেশের লোকের হাতে ছিল তখন অস্ত্র। ভারতব্যাপী সুরু হয় এক বিরাট বিদ্রোহের পরিকল্পনা।

বিদ্রোহের নির্দিষ্ট তারিখ ২৩শে জুন, পলাশীর যুদ্ধের তারিখ।

শুধু যদি সিপাহীর-ই বিদ্রোহ হ'ত তা হলে কি হত পরিকল্পনা? পলাশীর যুদ্ধের তারিখ বা কেন হ'ল বিদ্রোহের তারিখ?

এই বিদ্রোহে ছিল স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সর্বস্তরের মানুষের স্বাধীনতার সঙ্কল্পে জোট। তাই ত' সিপাহী বিদ্রোহ আখ্যা মিথ্যা —সত্য ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম আখ্যা।

এই আখ্যা দিলেন বীর সাভারকর—বই লিখে প্রচার করলেন ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী, প্রচার করলেন সশস্ত্র বিপ্লবের কথা…প্রচার করলেন Cult of Bomb—বোমার রাজনীতি।

১৯০৭-১০ই মে। 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এ বীর সাভারকরের পরিচালনায় প্রথম সুরু হয় ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব।

'ইণ্ডিয়া হাউস'এ বাসিন্দাগণ সারা দিন উপবাসব্রত পালন করে ভারতকে স্বাধীন করবার শপথ নিলেন।

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে (১৮৫৭) মৃত বীর যোদ্ধাদের 'শহীদ' আখ্যা দেওয়া হয় এবং তাঁদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হয়।

শহীদদের বীরোচিত আত্মোৎসর্গ সম্বন্ধে ভাষণ দিলেন অনেক বক্তা।

এইদিন প্রত্যুষে 'ইণ্ডিয়া হাউস'এর বাসিন্দাদের মধ্যে বিতরিত হয় শহীদের স্মৃতি অঙ্কিত ব্যাজ।

বিশ বৎসর বয়স্ক মদন লাল ধীংগরাও পান একটি ব্যাজ।

পরদিন ধীংগরা বুকে সেই ব্যাজ এঁটে ইউনিভারসিটি কলেজের কক্ষে প্রবেশ করলে ইংরেজ ছেলেমেয়েরা মারমুখী হয়ে ছুটে আসে। তাদের রক্তচক্ষুর কারণ—ঐ ব্যাজ।

তারা দাবী তুলল—Remove the badge (ব্যাজ খুলে ফেলো)।

দৃপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন ধীংগরা—No (না)

"You must. Our demand. That is nuisance." (তোমাকে অবশ্য খুলতে হবে। আমাদের দাবী। ওটা বিরক্তিকর বস্তু)। বলল ইংরেজ ছেলেমেয়েরা।

বুক ফুলিয়ে তাদের সামনে দাঁড়ালেন ধীংগরা। বললেন—Shut up or I shall teach you a lesson. That is our honour, our pride. (চুপ কর নচেৎ আমি তোমাদের শিক্ষা দিব। এটি আমাদের সম্মান, আমাদের গৌরব)।

ধীংগরার দৃপ্তভঙ্গীর সামনে আর দাঁড়াতে পারল না ইংরেজ ছেলেমেয়েরা। তারা পিছু হঠল।

ধীংগরার মুখে তখন বিজয়ের আনন্দরেখা। হৃৎপিণ্ডে তখন দ্রুত স্পন্দন। চিরবিদ্রোহী পঞ্চনদের বিপ্লবী গদরের রক্তে লেগেছে যেন বাণ।

॥ *পাঁচ* ॥

ধীংগরার রক্তে লিখিত প্রার্থনা-পত্র

[১৯০৭—শেষ ভাগ]

লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এ বীর সাভারকরের পরিচালনায় চলেছে তখন নিত্য নূতন বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড। ১৯০৭ সালের শেষ ভাগে খবর এল নেপালের মুখ্যমন্ত্রী লণ্ডনে আসছেন। ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা (তখন প্যারিসে কর্মরত) প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর কর্মাধ্যক্ষ যুবক সাভারকরের স্বপ্ন এবং তজ্জন্য সাভারকর অনুধাবন করলেন গুর্খা জাতির সহায়তা একান্ত প্রয়োজনীয়।

লণ্ডনে আগত মুখ্যমন্ত্রীর নিকট এতদুদ্দেশ্যে একখানি পত্রপ্রেরণের আবশ্যকতা অনুধাবন করলেন সাভারকর। তজ্জন্য একখানি প্রাসঙ্গিক পত্র রচনার ভার দিলেন সাভারকর 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর অন্যতম সদস্য বি. বি. এস. আয়ারের উপর। স্থির হ'ল পত্রখানি লিখিত হবে ধীংগরার রক্তে এবং পত্র প্রেরক হবেন 'ইণ্ডিয়া হাউস' -এর অন্যতম সদস্য লণ্ডনের আইন কলেজের ছাত্র কাথিয়াওয়াড়া বাসী সরদার সিং রাব রাণা। আসুন—এখন বার রাণার সাথে পরিচিত হই।

সরদার সিং রাব রাণা (১৮৭০-১৯৪৯)

সৌরাষ্ট্র রাজ্যভুক্ত কাথিয়াওয়াড়ার লিম্বডির সন্নিকট কন্থারিয়া গ্রামে মহান্ বিপ্লবী সরদার সিং রাব রাণা ১৮৭০ সালে সৌরাষ্ট্র রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রাম্য স্কুলে বাল্যশিক্ষার পর তিনি প্রথমে ধারংগপুরা এবং রাজকোট হাইস্কুলে শিক্ষালাভ করেন এবং ১৮৯১ সালে রাজকোট হাইস্কুল থেকে তিনি এন্ট্রান্স

পাশ করত: বোম্বাই-এর এলিফিনটন কলেজ থেকে ১৮৯৭ সালে বি. এ. পাশ করেন। ১৮৯৮ সালের ২৩শে এপ্রিল তিনি আইন পড়বার জন্য লণ্ডনে যান এবং লণ্ডনের আইনকলেজে প্রবেশ করেন —১০ই মে।

পুনায় কংগ্রেসের অধিবেশন (১৮৯৫)-এ কংগ্রেস-প্রধান সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেশনেতা শ্রীতিলকের সান্নিধ্যে ছাত্র জীবনে আসেন শ্রীরাব রাণা। পোষাকে স্বাদেশিকতা ছিল এই তরুণ ছাত্রটির প্রধান বৈশিষ্ট্য। লণ্ডনে বিরূপ সমালোচনার মধ্যেও তরুণ যুবক রাব রাণা তাঁর কাথিয়াওয়াড়ি পোষাক ত্যাগ করেন নি।

স্বাধীনতার পর এই পঁচিশ বছরে স্বাধীন ভারত—বিশেষত: অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় পোষাককে বিদায় দিয়েছে এবং ড্রেন প্যাণ্ট ও রঙ বেরঙের বিচিত্র হাওয়াই শার্ট এখন আমাদের তরুণদের অভিনব পোষাক।

রেডিও প্রচারিত মহান্ ব্যক্তিদের মহান বাণী, রাজনৈতিক সভার মঞ্চে দেশনেতা ও দেশনেত্রীদের স্বাদেশিকতার ভাষণ, সংবাদপত্রে দেশপ্রেমের বুলি যে তাদের মনে রেখাপাত করতে পারছে না তার প্রধান কারণ স্বাধীনতার পর আমাদের দেশের ধনিক শিল্পপতিরা আমাদের তরুণদের রুচিভ্রষ্ট করবার জন্য যেন উঠে পড়ে লেগেছেন।

তার প্রধান প্রমাণ সিনেমা। আমাদের রুচি যতদূর নোংরা করা যায় তার জন্য শিল্পপতিদের ত্রুটির অভাব নেই। নিম্নরুচির জোলুস পোষাক পরিচ্ছদ শিল্পপতি ব্যবসায়ীরা বাজারে বেপরোয়া চালাচ্ছেন। যেমন, তথাকথিত আর্টের দোহাই দিয়ে ধনিকের পরিবেশিত সিনেমা ও ধনিকের পরিচালিত সংবাদপত্রে, সাহিত্য যৌন আবেদন প্রচারে বেপরোয়া হয়েছে।

এখনও দেশে সুরুচিযুক্ত ব্যক্তির অভাব হয় নি। তাঁদের হৈ-

চৈতে মাঝে মাঝে অশ্লীলতা বন্ধের আন্দোলত জাগে। ব্যস, ঐ পর্যন্ত।

লণ্ডনে তখন মডারেট দাদাভাই নৌরাজী 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করতঃ ইংলণ্ডে ভারতবাসীর অধিকার রক্ষার জন্য আইন সম্মত আন্দোলনে ব্রতী ছিলেন। লণ্ডনে আসার পর লণ্ডন আইন কলেজের ছাত্র রাব রাণা শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মার (১৮৯৭ সালে লণ্ডনে আগত)র সহিত পরিচিত হন এবং দাদাভাই নৌরাজীর 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' এর সাথে উভয়ে যুক্ত হন কিন্তু বৈধ আন্দোলনের অসারত্ব উপলব্ধি করতঃ উভয়ে ইহা পরিত্যাগ করেন। শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা অতঃপর লণ্ডনে 'হোমরুল সোসাইটি' স্থাপনা করেন। এর অধ্যক্ষ হন শ্রীশ্যামজী এবং উপাধ্যক্ষ হন শ্রীরাণা (১৯০৭)। এর পর শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা নিজ অর্থে সাগর পারে ভারতীয় বিপ্লব আন্দোলনের কেন্দ্র 'ইণ্ডিয়া হাউস' প্রতিষ্ঠা করলে রাব রাণা এই 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর সদস্য হন এবং সাগরপারে ভারতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।...

* * * *

ধীংগরার প্রসন্নমুখে অন্তহীন হাসি—না ভয়, না সঙ্কোচ, না ছিল একটুও বিরক্তি। ধারাল ছুরি তিনি বসিয়ে দিলেন বা হাতের মোটা আঙুলের নরম চামড়ার উপর। দর্ দর্ ধারায় রক্ত পড়ল একটা কাপের ভিতর। সেই রক্তে পত্র লিখলেন আয়ার। পত্রের শেষাংশে তিনি লিখলেন—

> ভারতের তরুণ ছাত্রদের উপর আস্থা রাখুন। আইরিশও ইটালিয়ান শহীদদের মত শহীদ হবার যোগ্য তরুণ আমাদের মধ্যে অনেক আছেন। এই পত্র লিখিত হচ্ছে ইনজিনিয়ারিং কলেজের এক ছাত্রের রক্তে।

নেপালের মুখ্যমন্ত্রীর একান্ত সচিব পত্রোত্তরে জানালেন—ভগবান আপনাদের ইচ্ছা পূর্ণ করুন।

ভগবান ভারতের ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন।

সেই ইচ্ছাপথের প্রথম পদক্ষেপ সাগর পারের ভারতীয় ছাত্রদের মুক্তিতীর্থ 'ইণ্ডিয়া হাউস' আর সেই তীর্থের শহীদ সাগরপারের শহীদ ধীংগরা।

সেই ইচ্ছাপথের শেষদিনে ভারতের নির্বাসিত সন্তান রাব রাণা প্যারিসের আশ্রয়স্থল থেকে স্বীয় জন্মভূমির মাটিতে পদার্পণ করেন—ডিসেম্বর ৯, ১৯৪৭।

পাঁচ মাস স্বদেশে অবস্থানের পর কাতরকণ্ঠে তিনি বললেন—এই কী স্বাধীনতা!

রক্তসিক্ত পঞ্চনদের নির্বাসিত বিপ্লবী অজিত সিং—শহীদ ভগতসিং-এর অন্যতম পিতৃব্য অজিত সিং—মুক্তির পর ডালহৌসি পাহাড়ে মৃত্যুশয্যায় ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে জানালেন তাঁর মত: এই কী স্বাধীনতা!—সেই দাঙ্গা, চোরাকারবার, ভেজাল খাবার, দুর্মূল্যের বাজার, ধনিক মালিকের অত্যাচার, পুলিশী অনাচার, আমলাতান্ত্রিক সরকার, সরকারী দুর্নীতি আর প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রাধান্য।··· তারপর···

আরও বীভৎস কাণ্ড। জাতির পথপ্রদর্শক গান্ধীজীকে হত্যা।

ব্যথিত চিত্তে সরদার সিং রাব রাণা জন্মভূমি ত্যাগ করে আবার প্যারিসে প্রত্যাবর্তন করলেন—এপ্রিল ২৩, ১৯৪৮। সেখানে পর বৎসর ৭৯ বৎসর বয়সে তিনি দেহরক্ষা করেন।

॥ ছয় ॥

'ইণ্ডিয়া হাউস'-এ ধীংগরার ঘুমভাঙা চোখে নব জীবনের স্বপ্ন

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড। এর নাম শোনেননি এমন ভারতবাসী খুব কমই আছেন। বৃটিশ সরকারের গুপ্তচর-বিভাগের এক ভয়ঙ্কর কেন্দ্র—কলকাতায় যেমন ইলিসিয়াম রো। ধীংগরার পিতা পাঞ্জাবের একজন বিখ্যাত ধনী ডাক্তার। এই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে ধীংগরার পিতার নিকট গেল একখানি পত্র :

আপনার পুত্র ধীংগরা বিলাতে পড়াশোনায় অবহেলা করছে এবং এখানকার অবাঞ্ছিত রাজদ্রোহীদের সাথে মিশছে। আপনার হস্তক্ষেপ একান্ত কাম্য।

ধীংগরার পিতা ধীংগরার নিকট একখানি পত্র লিখলেন :

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অভিযোগক্রমে তোমাকে জানানো যাচ্ছে যে অবিলম্বে রাজদ্রোহীদের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ না করলে তোমার সহিত কোন সম্পর্ক রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

বিলাতের ভারতসচীব (Secretary of State for India) তখন লর্ড মর্লি। তাঁর পলিটিকাল এডিসি তখন স্যার কার্জন উইলি। উইলির উপর ছিল বিলাতে পাঠরত ভারতীয় ছাত্রগণের তত্ত্বাবধানের ভার। তাঁরই কাছে পত্র দিলেন ধীংগরার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা :

> আমার বিপথগামী ভ্রাতা ধীংগরার চরিত্র সংশোধনের ভার আপনার উপর ন্যস্ত। আপনি তাঁকে সুপথে পরিচালিত করুন।

লণ্ডনের ইনজিনিয়ারিং কলেজে পাঠরত ধীংগরার সহিত সংযোগ স্থাপন করলেন বিলাতের ভারতীয় ছাত্রগণের তত্ত্বাবধায়ক স্যার কার্জন উইলি এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতার পত্রানুযায়ী ধীংগরার মতিগতি পরিবর্তনে উইলি সচেষ্ট হ'লে ধীংগরা তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন :

> আমি সাবালক শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক। ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা আমার আছে। অতএব আপনি ও পিতা ইহা জেনে রাখুন যে আমি সঠিক পথে চলতে পারব। আপনাদের সাংসারিক স্বার্থবাদ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার পথে না গিয়ে আমি যদি আমার মনোনীত পথে চলি তাতে আপনি ও পিতা খবরদারি করতে যাবেন না। কারণ আমার ব্যক্তিত্বের পক্ষে ইহা ক্ষতিকর।

পিতা ও ভ্রাতার সাথে এবম্প্রকার পত্র আদান-প্রদানের পর উভয়পক্ষে আর কোন সম্পর্ক থাকল না। ধীংগরা ফেললেন স্বস্তি ও মুক্তির নিঃশ্বাস।...

*　　*　　*　　*

রহস্যময়ী সমুদ্রকন্যা ব্রিটেন। অতলান্তিক মহাসাগরের বুকে নীল সাগরের উত্তাল জলে কাঁপছে মহাদ্বীপ। রাত্রির অন্ধকারের পর নূতন উষা। শেষ রাতের অন্ধকার। ঘুম থেকে উঠছে যেন সারা শহর। 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর কক্ষের শয়নশয্যা থেকে গাত্রোত্থান করলেন ধীংগরা। চোখে মুখে তাঁর নবজীবনের স্বপ্ন—পরাধীন মাতৃভূমির মুক্তির জন্ম আত্মদানের সঙ্কল্প।

স্তিমিত অন্ধকারের মধ্যে বাজছে জাহাজের বাঁশী। জাহাজ ছাড়ছে ডোভারের কূল থেকে ক্যালের পথে।

॥ সাত ॥

আলিপুর বোমার মামলার (১৯০৮) বিচারের প্রতিবাদ

স্তিমিত অন্ধকারের মধ্যে বাজছে ইংলিশ চ্যানেলের নীল জলে জাহাজের বাঁশি। জাহাজ ছাড়ছে ডোভারের কূল থেকে ক্যালের পথে। এই পথে শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা প্যারিস যাত্রা করেছেন। লণ্ডন আইন-কলেজের ছাত্র সৌরাষ্ট্র রাজপরিবারের সন্তান শ্রীরাণা ছিলেন শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মার সহযোগী। এ কথা আমরা পূর্বেই বলেছি।

শ্রীশ্যামজী টেম্পলইন-এর ব্যারিষ্টারি ছাত্র মারাঠি যুবক শ্রীবিনায়ক দামোদর সাভারকরের উপর স্বীয় প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর ভার অর্পণ করতঃ ১৯০৫ সনে প্যারিসের বাসিন্দা হন এবং সেখানে খুলেছেন বিপ্লবান্দোলনের আর একটি কেন্দ্র।

শ্রীশ্যামজীর প্যারিস যাত্রার পূর্বেই ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মেলা উপলক্ষে শ্রীরাণা লণ্ডন থেকে প্যারিসে যান এবং বোম্বাই-এর এক জহুরীর দোকানের পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন। এর আয় বিপ্লবান্দোলনে ব্যয়িত হ'ত।

এই সময়ে শ্রীরাণা শ্রীতিলক ও শ্রীঅরবিন্দের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত মদন যাদবকে সুইজারল্যাণ্ডে সৈনিক-শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন এবং মেদিনীপুরের প্রসিদ্ধ বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগোকে শ্রীরাণা প্যারিসে নিজ গৃহে আশ্রয় দেন ও একজন রুশ বিপ্লবীর কাছে তাঁর বোমা তৈরীর শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

এই দুই বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে শ্রীরাণা বিদ্রোহী ঘোষিত হন এবং তাঁর ভারত প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়।

১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্টের স্বাধীনতার পর তাঁর তেত্রিশ

বৎসরের দীর্ঘ নির্বাসন দণ্ড ও ইংরাজ ও ফরাসী পুলিশের নির্যাতনের অবসান হয়।

যাক্ সে কথা। এ কথা উত্থাপনার কারণ আলিপুর বোমার মামলার সাথে 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর সম্পর্কটুকু দেখাবার জন্য। এই সম্পর্কের সূত্র শ্রীতিলক ও শ্রীঅরবিন্দ এবং হেমচন্দ্র কানুনগো। সেই কথা এখন বলছি—

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রাক্‌কালে শিবাজীর দেশ মারাঠায় চল্‌ছিল সাগ্নিক মুক্তিযজ্ঞের আয়োজন। গণপতি আন্দোলন ও শিবাজী উৎসবের মধ্য দিয়ে সেখানকার বিপ্লবাত্মক আয়োজন সুরু হয়। বাল গঙ্গাধর তিলক ছিলেন সে আন্দোলনের নায়ক।

মহারাষ্ট্র কেশরী লোকমান্য তিলক (১৮৫৬—১৯২০)-এর নায়কত্বে মারাঠা দেশে সেদিন চল্‌ছিল পূর্ণ স্বাধীনতার কামনায় বিপ্লববাদ। এই মারাঠা দেশেই বরোদার বৈপ্লবিক নেতা ঠাকুর সাহেবের নিকট বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হন শ্রীঅরবিন্দ...

সুদূর মারাঠা দেশে আছেন অরবিন্দ সেদিন বই-এর পাহাড়ের মধ্যে। কানে ভেসে এল তাঁর এই নবজীবনের ক্রন্দন। মুখ তুলে চাইলেন তিনি নিজের জন্মভূমি বাংলাদেশের দিকে। আনন্দমঠ আর বিবেকানন্দের বাণীতে আগুন লেগেছে সে দেশে কিন্তু সে আগুন সমাজের উচ্চস্তরে...নিম্নস্তরে কই?

তিনি বললেন—Wanted more repression! আরও অত্যাচার চাই। বাংলার ঘরে ঘরে ইংরাজের ব্যাটন চলবে তবে ঐ আগুন লাগবে ঘরে ঘরে। তিনি এলেন বাংলায়।

১৮০২ খৃষ্টাব্দের কথা সে। দু বছর তিনি ঘুরলেন বাংলার জেলায় জেলায়। গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার সুযোগ ও সম্ভাবনা দেখে তিনি বেড়ালেন। বিচ্ছিন্ন গুপ্ত সমিতিগুলো এক করবার কথা ভাবলেন তিনি। এ কাজে ব্রতী হলেন তাঁরই নির্দেশে তাঁর ছোট

ভাই বারীন ঘোষ। বাংলায় বিপ্লববাদের দানা বাঁধে। সেই বিপ্লববাদের ঋষি শ্রীঅরবিন্দ।

বাঙালীর পায়ের চলার শব্দে আঁৎকে উঠে ইংরাজ রাজপুরুষ।

ভারতের বড়লাট তখন লর্ড কার্জন। বাংলাকে পঙ্গু করবার জন্য তিনি বাংলাকে দুভাগ করবার পরিকল্পনা করলেন।

১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর বাংলা হ'ল দুভাগ।

বঙ্গভঙ্গের ব্যথা বাংলার বুকে আনল এক দারুণ বিপ্লব।

বাংলা ভাগ হয় ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর। ঠিক ছ মাস পর অরবিন্দ—বারীন ঘোষের বিপ্লবীদল চাঁপাতলায় মেডিক্যাল কলেজের দক্ষিণে স্থাপন করলেন আস্তানা।

চাঁপাতলায় আস্তানা ছিল দেড় বছর—১৯০৬ সনের মার্চ মাস থেকে ১৯০৭ সনের অক্টোবর পর্যন্ত। তারপর আস্তানা চাঁপাতলা থেকে উঠে আসে মাণিকতলায় মুরারী পুকুর রোডে বারীন ঘোষের নিজস্ব বাগান বাড়ীতে। মাণিকতলার বাগানে হয় বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার আড্ডা—১৯০৮ সনের মে'র প্রারম্ভ পর্যন্ত।

মেদিনীপুরের উদ্যোগী কর্মী হেমচন্দ্র কানুনগো নিজের বাড়ি ঘর-দোর বিক্রি করে সাগর পারে যান বোমা তৈরি শিখবার জন্য। পূর্বেই উল্লিখিত আছে যে শ্রীরাব রাণা প্যারিসে নিজগৃহে হেমচন্দ্র কানুনগোকে আশ্রয় দেন ও একজন রুশ বিপ্লবীর কাছে তাঁর বোমা তৈরীর শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

প্যারিস থেকে ফিরে এসে হেমচন্দ্র মুরারীপুকুর বাগান-বাটির আড্ডায় যোগদান করেন। হেমচন্দ্রের হাতে তৈরি হয় বোমা। এই বোমায় মুরারীপুকুর বাগান থেকে সুরু হয় বাংলার প্রথম বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হয় প্রবল থেকে প্রবলতর। কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেব আন্দোলনকারী ছেলেদের

প্রকাশ্য আদালতে বেত মারবার আদেশ দিতেন। কলকাতার কেন্দ্রীয় গুপ্তসমিতি তাঁর বিচারের ভার দিলেন অরবিন্দ ও অপর দুজন নেতার উপর। বিচারে তাঁর মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা হয়।

কিংসফোর্ড মজঃফরপুরে বদলি হন।

কেন্দ্রীয় গুপ্তসমিতির নির্বাচিত ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী কিংসফোর্ড সাহেবকে মারতে চললেন। কিংসফোর্ড ভ্রমে তাঁরা মারলেন দু'জন মেম সাহেব। পুলিশ অরবিন্দ সমেত সমস্ত বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করল। বন্দী বিপ্লবীদের নিয়ে স্থুরু হ'ল আলিপুর বোমার মামলা (১৯০৮—২মে)।

লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া হাউস' আলিপুর বোমার মামলার বিচারে জানালেন প্রতিবাদ। এর প্রধান উদ্যোক্তা 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর পরিচালক বিনায়ক দামোদর সাভারকর বা বীর সাভারকর। সাভারকর মারাঠী যুবক এবং তিলকের আদর্শে অনুপ্রাণিত। নাসিকের তিন ভাই সাভারকর পুণার তিন ভাই চাপেকারের আত্মদানে প্রভাবান্বিত হন এবং বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হন।

বড় ভাই গণেশ দামোদর সাভারকর:

[জুন ২৩, ১৮৮৩—মে ১৬, ১৯৪৫]

মেজ ভাই বিনায়ক দামোদর সাভারকর (বীর সাভারকর):

[মে ১৮, ১৮৮৫—ফেব্রুয়ারী ২৮, ১৯৬৬]

ছোট ভাই ডাঃ নারায়ণ দামোদর সাভারকর:

[মে ২৫, ১৮৮৮—অক্টোবর ১৯, ১৯৪৯]

১৯০৫ সনের পূর্বেই সাভারকর ভ্রাতৃত্রয় প্রতিষ্ঠা করেন বৈপ্লবিক সংগঠন—প্রথমে 'মিত্রমেলা' এবং পরে 'অভিনব ভারত মণ্ডলী' (New Indian Society)। বৈপ্লবিক মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ মেজ ভাই বিনায়ক দামোদর সাভারকর ব্যারিষ্টারি পড়বার জন্য ১৯০৬ সনে লণ্ডনে যান এবং 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর সাথে সংশ্লিষ্ট হন—ইহা পূর্বেই উল্লিখিত আছে।

বিপ্লবী শহীদ কানাইলালের চিতাভস্ম ও লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া হাউস'

আলিপুর বোমার মামলার নরেন গোঁসাই নামক একজন বন্দী হলেন রাজসাক্ষী। বিপ্লবী সহকর্মীদের বাঁচাবার জন্য কানাইলাল দত্ত নামক আলিপুর বোমার মামলার অন্যতম বন্দী জেলের ভিতর বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে হত্যা করেন—১লা সেপ্টেম্বর, ১৯০৮। বিচারে কানাইলালের ফাঁসি হয়।

মারাঠায় চাপেকার তিন ভাইও বিনায়ক রাণাডের ফাঁসি (পুনাঃ ১৮৯৯) এবং বাংলায় ক্ষুদিরামের ফাঁসির (মজঃফরপুর : ১৯০৮) পর কানাইলালের ফাঁসি হয়—কলকাতায় ১০ই নভেম্বর, ১৯০৮।

কলকাতার জনগণ শহীদ কানাইলালের শব নিয়ে বার করলেন মিছিল। কানাই-এর শবাধার গীতা আর ফুলের মালায় ভরে যায়। কানাই-এর চিতাভস্ম নিয়ে পড়ে গেল কাড়াকাড়ি। এক মুঠি চিতা-ভস্ম ভারতীয় বিপ্লবীদের মারফত ইংলণ্ডের বিপ্লবীদের কাছে পৌঁছে যায়। চিতাভস্মের একাংশ পান লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর বিপ্লবী-গণ। এই ভস্মের তিলক কপালে পরে 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর বিপ্লবীগণ শপথ নিলেন—ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান আনবোই আনবো।

কানাইলালের চিতাভস্মের স্বাগত সমারোহ উপলক্ষে 'ইণ্ডিয়া হাউস'এ হয় এক মহতী জনসভা। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন 'ইণ্ডিয়া হাউস'এর বিখ্যাত বিপ্লবী কাথিওয়াড়ার সরদার সিং রাব রাণা।

এরপর বৃটিশ গুপ্তচর বিভাগের দৃষ্টি 'ইণ্ডিয়া হাউস'এর উপর এত সজাগ হয় যে কোন গোপন বৈপ্লবিক কার্য করা অসম্ভব হয়। ফলে শ্রীরাব রাণা পুনরায় লণ্ডন ত্যাগ করে প্যারিসে চলে যান এবং সেখানে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ও মাডাম কামার সহিত মিলিত হয়ে বৈপ্লবিক কার্যে লিপ্ত হন।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে লণ্ডন ত্যাগ করে তিনি প্যারিসে যান। এই সময় তিনি প্যারিসে এক রুশ বিপ্লবীর কাছে হেমচন্দ্র কানুনগোর বোমা তৈরী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

১৯০৫ সনে তিনি বিবাহ করতে দেশে যান এবং ছ সপ্তাহ দেশে অবস্থান করে অনুধাবন করলেন যে সাগরপারে বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড ভারতে সৃষ্টি করেছে শুভ প্রতিক্রিয়া। এরপর তিনি লণ্ডনে আসেন এবং আরও বিপ্লবী-ছাত্র তৈরীর মানসে নিজ অর্থে 'ইণ্ডিয়া হাউস' থেকে আরও কয়েকটি ছাত্রবৃত্তি ঘোষণা করেন।

এর পরই 'ইণ্ডিয়া হাউস'এ শহীদ কানাইলালের চিতাভস্মের স্বাগত-সমারোহ ও তারপরই শ্রীরাব রাণার চিরদিনকার মত প্যারিস যাত্রা—চিরদিনের মত কেন না প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সুরু হবার পর থেকে ভারতের স্বাধীনতা পর্যন্ত দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর ফ্রান্সে নির্বাসিত বন্দী জীবন হ'ল তাঁর শেষ ভাগ্যলিপি।

॥ আট ॥

ফ্রান্সে নির্বাসিত শ্রীরাব রাণার কথা

ফরাসীর মাটিতে সাগর পারের মহান্ বিপ্লবী সৌরাষ্ট্রের সুসন্তান শ্রীরাব রাণার চৌত্রিশ বৎসর ব্যাপী নির্বাসিত জীবন—নির্যাতন ও কষ্ট ভোগের এক ভয়াবহ কাহিনী। এই কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ না দিলে 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর প্রথম সারির এক শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর উল্লেখ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সেই কাহিনী এবার শুনুন :

প্যারিসে শ্রীরাব রাণা (১৯০৮) :

শহীদ কানাইলাল (আলিপুর বোমার মামলা—১৯০৮)-এর চিতাভস্ম সমারোহ অনুষ্ঠানের পর 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর উপর বৃটিশ গুপ্তচরের পড়ল সর্তক দৃষ্টি—ফলে সরদার সিং রাব রাণার পক্ষে লণ্ডনে বিপ্লবাত্মক কার্য করা অসম্ভব হয়ে উঠল। তিনি লণ্ডন ত্যাগ করে প্যারিসে মাডাম কামার গৃহে আশ্রয় নিলেন এবং মাডাম কামার সাথে স্ট্যুটবার্গ (জার্মানী) প্রথম আন্তরাষ্ট্রীয় সমাজবাদী কনফারেন্সে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। প্যারিসে মাডাম কামা ও শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার সহযোগিতায় শ্রীরাব রাণা বৈপ্লবিক কার্যে লিপ্ত হন।

প্যারিসে শ্রীরাব রাণার বৈপ্লবিক কার্য :

১৯০৮ সনের শেষাশেষি সাভারকর ইংলণ্ড থেকে প্যারিসে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য যে ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন তিনি কুড়িটি ব্রাউনিং অটোমেটিক পিস্তল, একটি কোল্ট রিভলবার ও একটি বেলজিয়ম মেক পিস্তল বিস্তর কার্তুজ-সহ ক্রয় করেন এবং শ্রীরাব রাণার হাতে

সমর্পণ করেন। শ্রীরাব রাণা তাহা ইংলণ্ডে সাভারকরের নিকট প্রেরণ করেন।

সাভারকরের নিকট থেকে ধীংগরা শেষোক্ত কোল্ট রিভলবারও বেলজিয়ম-মেক পিস্তল পান, যাহা স্যার কর্জন উইলির হত্যায় (জুলাই—১৯০৯) ব্যবহৃত হয়। বাকি কুড়িটি ব্রাউনিং অটোমেটিক পিস্তল 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর পাচক চতুর্ভুজ আমীন মারফৎ বোম্বাই-এ প্রেরণ করেন—যাহা ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে বোম্বাই পৌঁছায় এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনে ও পুনার ম্যাজিষ্ট্রেট জ্যাকসন হত্যা (ডিসেম্বর ২১, ১৯০৯) এবং মাদ্রাজের তিনেভেল্লীর ম্যাজিষ্ট্রেট এসের হত্যায় (জুন ১৭, ১৯১১) ব্যবহৃত হয়।

ভারত সরকার কর্তৃক শ্রীরাব রাণা বিদ্রোহী ঘোষিত :

দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের বৈপ্লবিক কার্যকলাপের (১৯০৯—১১) ফলে ভারত সরকার মনে করেন যে এর পিছনে প্যারিসে অবস্থিত 'ইণ্ডিয়া হাউস'এর বিপ্লবী শ্রীরাব রাণার গোপন হাত আছে। ফলে ভারত সরকার কর্তৃক শ্রীরাব রাণা বিদ্রোহী ঘোষিত হলেন এবং তাঁর ভারত-প্রবেশ নিষিদ্ধ হ'ল।

প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) ও শ্রীরাব রাণার বন্দীদশা :

'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর অন্যতম বিপ্লবী লালা হরদয়াল প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে শ্রীরাব রাণাকে লণ্ডনে প্রত্যাবর্তনের পরামর্শ দিলেন কিন্তু শ্রীরাব রাণার একমাত্র পুত্র 'তপোদক' প্যারিসে পীড়িত থাকায় তা সম্ভব হয় নি। ফলে ভারতীয় সেনা (বৃটিশ পক্ষ) প্যারিসে প্রবেশ করলে শ্রীরাব রাণা ফরাসী সরকার কর্তৃক 'ব্রারোডেকস' কারাগারে বন্দী হন—সেপ্টেম্বর ৬, ১৯১৪।

ফ্রান্সের 'মানবিক অধিকার সমিতি'র প্রচেষ্টায় শ্রীরাব রাণা ৭ই জানুয়ারী, ১৯১৫তে মুক্তি পান কিন্তু স্ত্রীপুত্র সহ তাঁবুতে অন্তরীণ হন। এই তাঁবুতে ২৭শে জানুয়ারী (১৯১৫) তারিখে তাঁর বালকপুত্রের মৃত্যু হয়। অন্তরীণকাল চলে মার্চ, ১৯২০ পর্যন্ত। এই পাঁচ বৎসর তাঁকে দুধ ও তরকারির ব্যবসায় সংসার চালাতে হয়।

প্যারিসে প্রত্যাবর্তনের পর (মার্চ, ১৯২০) শ্রীরাব রাণা প্যারিসে আগত ভারতীয় নেতা—বিটল ভাই প্যাটেল, মৌলানা মহম্মদ আলি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অধ্যাপক সিল্ভালেয়োর সাথে মিলিত হন।

শ্রীশ্যামজী কৃষ্ণবর্মার বিরাট পুস্তকালয়ের সদ্ব্যবহার করেন ভারতীয় সংস্কৃতির পণ্ডিত অধ্যাপক সিল্ভালেয়ো।

এছাড়া প্যারিসে আগত ভারতীয় নেতা ডাঃ আনসারি, হাকিম আজমল খাঁ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু শ্রীরাব রাণার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

নেতাদের সহিত সাক্ষাৎকারে শ্রীরাব রাণা জানতে পারলেন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সুরু হয়েছে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়—প্রথম পর্যায় প্রতিবাদমূলক বৈপ্লবিক কাণ্ড (১৯০৮-১১) ও বিদ্রোহমূলক বৈপ্লবিক কাণ্ড (১৯১৫) এবং তারপর এই দ্বিতীয় পর্যায়—অহিংস আঘাতমূলক গান্ধীজীর গণআন্দোলন (১৯২১)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯—৪৫) ও শ্রীরাব রাণার পুনরায় বন্দীদশা : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে শ্রীরাব রাণা এক পুরানো বন্ধুর সাথে প্যারিসের বাইরে বাস করছিলেন। যুদ্ধ সুরু হয়ে গেলে তিনি প্যারিসবাসী হন এবং ফ্রান্সজয়ী জার্মানির হাতে নজরবন্দী থাকেন ১৯৪১ সনের এপ্রিল মাস পর্যন্ত।

নেতাজী সুভাষের হস্তক্ষেপে শ্রীরাব রাণা অন্তরীণ মুক্ত হন এবং নেতাজীর প্রেরণায় তিনি ফ্রান্সস্থিত ভারতীয়দের নিয়ে ২৬শে জানুয়ারী তারিখে 'স্বাধীনতা দিবস' এবং ১৩ই এপ্রিল তারিখে 'জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস' পালন করেন। ফলে ফ্রান্স-প্রবাসী ভারতীয়রা ভারতে আর ব্রিটিশ শাসনের অস্তিত্ব পছন্দ করেন না।

১৯৪৫ সনে ফ্রান্স পুনরায় মিত্রশক্তির অধীনে আসে। তখন শ্রীরাব রাণার উপর পুনরায় সুরু হয় নিপীড়ন। ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্টের স্বাধীনতার পর শ্রীরাব রাণা প্যারিসের আশ্রয় স্থল থেকে স্বীয় জন্মভূমির মাটিতে পদার্পণ করেন—ডিসেম্বর ৯, ১৯৪৭।

পাঁচ মাস স্বদেশে অবস্থানের পর কাতর কণ্ঠে তিনি বললেন —এই কী স্বাধীনতা!—সেই দাঙ্গা, চোরা কারবার, ভেজাল খাবার, দুর্মূল্যের বাজার, ধনিক মালিকের অত্যাচার, পুলিশী অনাচার, আমলাতান্ত্রিক সরকার, সরকারী দুর্নীতি আর প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রাধান্য।...

তারপর .....

আরও বীভৎস কাণ্ড। জাতির পথ প্রদর্শক গান্ধীজীকে হত্যা। ব্যথিত চিত্তে সরদার সিং রাব রাণা জন্মভূমি ত্যাগ করে আবার প্যারিসে প্রত্যাবর্তন করলেন—এপ্রিল ২৩, ১৯৪৮। সেখানে পর বৎসর ৭৯ বৎসর বয়সে তিনি দেহরক্ষা করেন।

॥ নয় ॥

আলিপুর বোমার মামলা (১৯০৮) ও গণেশ দামোদরের দণ্ড (জুন, ১৯০৯)

প্রতিবাদে ধীংগরা :

ফেব্রুয়ারী ১৯০৯। 'ইণ্ডিয়া হাউস' এর পাচক চতুর্ভুজ আমীন লণ্ডন থেকে চলেছেন বোম্বাই। সঙ্গে একটি বালিকা ও আরও একজন পুরুষ। মালপত্রের মধ্যে একটি বাক্স।

বোম্বাই বন্দর। তীরে অপেক্ষমান বিনায়ক দামোদর সাভারকরের (বীর সাভারকর) দাদা গণেশ দামোদর সাভারকর। বাক্সটি নিয়ে তিনি চলে গেলেন নাসিকে। গোপনে রাত্রির অন্ধকারে নির্জন কক্ষে যখন এই বাক্সটি খোলা হ'ল তখন এর ভিতর থেকে বার হ'ল কুড়িটি ব্রাউনিং অটোমেটিক পিস্তল আর বুলেট। যথাস্থানে এদের রাখবার ব্যবস্থা করলেন গণেশ দামোদর সাভারকর।

নাসিকের বৈপ্লবিক সংস্থা 'অভিনব ভারত মণ্ডলী' (New India Society) মারফত সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে বৈপ্লবিক আন্দোলন প্রসারে গণেশ দামোদর তখন ব্রতী। নাসিক ছিল 'অভিনব ভারত মণ্ডলী'র প্রধান কেন্দ্র। অন্যান্য কেন্দ্র—বোম্বাই, পুনা, আমেদাবাদ, ঔরঙ্গাবাদ, হায়দরাবাদ, গোয়ালিয়র।

ভারতে 'অভিনব ভারত মণ্ডলী' মারফত অসির সাথে মসীর যুদ্ধ সুরু হয়। বীর সাভারকর কর্তৃক মারাঠি ভাষায় লিখিত 'ম্যাজিনির জীবনী' গণেশ দামোদর প্রকাশ করেন এবং বিতরণের ব্যবস্থা করেন। এই পুস্তকে শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামীর সহিত ম্যাজিনির তুলনা হয়েছে।

*　　*　　*

মার্চ ২, ১৯০৯। কলকাতা মানিকতলার একটা বাড়িতে খানাতল্লাসীর সময় পাওয়া যায় টাইপ করা কপি 'বোমা ম্যানুয়াল' (Bomb Manual)। আবার এরই একটা কপি পাওয়া যায় হায়দরাবাদে। পুলিশের সন্দেহ হয় 'অভিনব ভারত মণ্ডলী' এবং এর নায়ক গণেশ দামোদর সাভারকরের উপর। একটি আপত্তিজনক ভাষণের জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

*   *   *

জুন ৯, ১৯০৯। এর তিন মাস পর। গণেশ দামোদর ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ধারায় নাসিকের ম্যাজিস্ট্রেট এ, এম, টি জ্যাকসন কর্তৃক দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হলেন। লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড। 'অভিনব ভারত মণ্ডলী'র সভ্যগণ ক্ষুব্ধ হন। এক বিক্ষুব্ধ বিপ্লবী দক্ষিণ ঔরঙ্গাবাদের অনন্ত লক্ষ্মণ কানহুরের গুলিতে জ্যাকসন নিহত হন—ডিসেম্বর ২১, ১৯০৯।

তার আগের ঘটনা। বিলাতে ধীংগরার বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড —জুলাই ১, ১৯০৯।

ধীংগরার ফটোসহ ইস্তাহার বিতরণকালে বোম্বাইতে এক যুবক ধৃত হয়। চলুন এখন সাগর পারে যাই।

*   *   *

জুন, ১৯০৯। সাগর পারে 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এ লঘু অপরাধে গণেশ দামোদরের গুরুতম দণ্ডের প্রতিবাদে মহতী সভা হয়। বীর সাভারকর দিলেন উত্তেজনা পূর্ণ বক্তৃতা।

বদলার প্রতিজ্ঞা সকলের কণ্ঠে।···

আলিপুর বোমার মামলার বিচার ও গণেশ দামোদর সাভারকরের বিচারের প্রতিবাদের শরিক হলেন সাগরপারে ছাত্র ধীংগরা। এই উদ্দেশ্যে তিনি সংগ্রহ করলেন একটি কোল্ট রিভলবার এবং বেলজিয়াম মেক একটি পিস্তল।

১৯০৯ সনের জুন মাসে ধীংগরা সাভারকরকে বললেন—আলিপুর বোমার মামলার বিচারের প্রতিবাদে মুখর সারা বাংলাদেশ। নাসিকে আপনার দাদা গণেশ দামোদরের সাজা আমরা ভুলতে পারি না। আমি এর প্রতিবাদ করতে চাই। নিতে চাই প্রতিশোধ—দাঁতের বদলে দাঁত, রক্তের বদলা রক্ত!

সাভারকর ধীংগরার মুখের পানে তাকান।

ধীংগরা আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বললেন—আত্মদানের এই ত' সুবর্ণ সুযোগ।

সাভারকর নীরব। ধীংগরার চোখে-মুখে খেলছে উন্মাদনার বিজলীর খেলা। সাভারকরের দৃষ্টিতে তা এড়াল না। সাভারকর নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন—যদি তোমার প্রাণে আত্মদানের সঙ্কল্প এসে থাকে তা হলে আত্মদানের এই ত সময়। বিপ্লববাদীদের উপর সুরু হয়েছে বৃটিশ সরকারের চরম নির্যাতন। আত্মদানের এই ত' পরম লগ্ন।

'ইণ্ডিয়া হাউস'-এ সেদিন রাত্রে এলেন না ধীংগরা। অন্যান্য সদস্যরা বিস্মিত—কোথায় গেলেন কে জানে!

॥ দশ ॥

ধীংগরা কোথায় ?

ইষ্টবোর্ণ—ইংলণ্ডের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত সুন্দর, স্বাস্থ্যকর স্থান ইষ্টবোর্ণ। এখানে এক বন্ধুর গৃহে ধীংগরা আশ্রয় নিয়েছেন। সঙ্গে আছে কোল্ট রিভলবার আর বেলজিয়ম-মেক রিভলবার। নীরব, নিভৃত স্থান। তিনি নিয়মিত টারগেটিং অভ্যাস করছেন।

কে তাঁর শিকার ?

তদানীন্তন ভারতসচিব (Secretary of state for India) লর্ড মর্লির এ ডি সি স্যার কর্জন উইলি—Sir Curjon Wyllie যিনি ছিলেন লণ্ডনপ্রবাসী ভারতীয় ছাত্রগণের তত্ত্বাবধায়ক।

অপরাধ ?

উইলি ভারতীয় ছাত্রগণের সম্বন্ধে অশিষ্ট উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন—ভারতীয় ছাত্রগণ লণ্ডনে গোপন আন্দোলনে যুক্ত এবং ইংরাজহত্যার সমর্থক।

ভারতের রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার শত্রু বৃটিশ আমলারা নির্যাতন-কারী ইংরাজ রাজশক্তির এক একটি স্তম্ভ। এরূপ একজন ঐ উইলি। অতএব বদলা এঁরই প্রাপ্য।

॥ *এগার* ॥

ভারত সচিব লর্ড মর্লির এ ডি সি স্যার কর্জন উইলি হত্যা :

[জুলাই ১, ১৯০৯]

১লা জুলাই, ১৯০৯। সন্ধ্যা আট ঘটিকা। লণ্ডনের জাহাঙ্গীর হলে অবস্থিত ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউটে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের আজ বার্ষিক অধিবেশন।

উইলি স্যাভয় হোটেলে সান্ধ্য ভোজন সাঙ্গ করে চলেছেন এই সভায়। এই সভায় ভারতীয় ও ইউরোপীয় অভ্যাগতদের এক প্রীতি-সম্মেলনের আয়োজন হয়েছে।

হলঘর থেকে নামবার সিড়ির মুখে উইলির মুখোমুখী পড়লেন ধীংগরা। স্বাগত অভ্যর্থনা জানিয়ে ধীংগরা উইলির সাথে কয়েক মিনিট কথাবার্তা বললেন। সহসা ধীংগরা পিস্তল বার করে উইলির মুখে গুলি করলেন পর পর পাঁচটি। উইলি পড়ে গেলেন সিড়ির উপর। তাঁর অচেতন দেহ প্রাণহীন। পর পর পাঁচটি গুলিতে ক্ষত বিক্ষত উইলির দেহ আর চিনবার মত ছিল না।

কাবসলাল কাকা নামক লণ্ডন-প্রবাসী এক পার্শি উইলিকে বাঁচাতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হন এবং কয়েক ঘণ্টা পরে মৃত্যু মুখে পতিত হন।

ধীংগরাকে ধরে ফেলে একজন ইংরাজ কিন্তু ধীংগরা নিজেকে মুক্ত করে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হন।

মদন মোহন সিংহ নামক একজন ভারতীয় ছাত্র ধীংগরাকে ধরতে যান কিন্তু পারেন না। অবশেষে ধীংগরা একজন গোরা পুলিশের হাতে বন্দী হন।

হাতের রিভলবার ছাড়া ধীংগরার কাছে পাওয়া গেল আর একটি গুলিভরা পিস্তল। এ ছাড়া ধীংগরার কাছে পাওয়া গেল একটি কাগজ—তাতে লেখা ছিল হত্যার জন্য নির্দিষ্ট আরও কয়েক জন সাহেবের নাম। আর লেখা ছিল :

ভারতের স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক হত্যার
একান্ত দরকার।

এ ছাড়া আরও পাওয়া যায় আর একখানি লিখিত বয়ান। ধীংগরার ফাঁসির পূর্বে এ বয়ান প্রকাশিত হয় না। আমরাও যথাস্থানে দেবো তার বিবরণ।

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে ধীংগরার এই ঐতিহাসিক বয়ান ইংরাজ সমাজের উর্ধতন মহলে সৃষ্টি করে এক মহান্ আলোড়ন। লয়েড জর্জ ও উইনস্টন চার্চিল এই বয়ানের প্রশংসা করেন।

চার্চিল ধীংগরার এই ঘোষণা-পত্রকে আখ্যা দেন —Unparallelled record of patriotism অর্থাৎ দেশ-প্রেমের আসাধারণ দলিল।

॥ বার ॥

লণ্ডনের কোর্টে বন্দী ধীংগরা

[জুলাই ৩, ১৯০৯]

বন্দী ধীংগরাকে লণ্ডনের কোর্টে ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে আনা হ'ল ৩রা জুলাই, ১৯০৯।

তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ — পর পর দুটি হত্যা : ভারত সচিবের এ ডি সি উইলি হত্যা ও পার্শি ভদ্রলোক কাবসলাল কাকার হত্যা।

বন্দী ধীংগরা তাঁর জবানবন্দীতে বললেন—"আমি একজন দেশপ্রেমিক। বিদেশী শাসকের বন্ধন থেকে আমার দেশকে মুক্ত করবার জন্য আমি এই কার্য করেছি। পুলিশ রিপোর্টে এবং আপনার প্রশ্নে এই কার্যকে হত্যাকাণ্ড বলা হয়েছে। আমি এই 'হত্যা' আখ্যার প্রতিবাদ জানাই। আমি যা করেছি আপনার মত একজন ইংরাজ তাই করতেন যদি জার্মান জাতি আপনাদের প্রভু হয়ে বসত!"

ম্যাজিষ্ট্রেট বললেন—আপনার আর কিছু বলবার আছে?

ধীংগরা উত্তরে বললেন—আমার যা কিছু বলবার তা আমি আমার লিখিত বয়ানে বলেছি। আমি যখন আপনাদের পুলিশের হাতে ধরা পড়ি তখন পুলিশ তা আমার কাছ থেকে হস্তগত করে।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পুলিশের কর্তাকে প্রশ্ন করলেন—কি! ব্যাপারটি কি সত্য?

পুলিশের কর্তার উত্তর—হাঁ!

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আদেশ দিলেন—বয়ান কোর্টে দাখিল করা হ'ক।

পুলিশের কর্তা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ধীংগরার লিখিত বয়ান দাখিল করলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ঘোষণা করলেন—যথাসময়ে আসামীর লিখিত বয়ান প্রকাশিত হবে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে মামলা দায়রা আদালতে সোপর্দ হ'ল। বন্দী ধীংগরা চললেন লণ্ডনের ব্রিষ্টন জেলে। সেখানে তাঁর অবস্থিতি ২৩শে জুলাই, ১৯০৯ পর্যন্ত অর্থাৎ ২৩ দিন। তারপর ফাঁসির দণ্ডাজ্ঞা নিয়ে ধীংগরা চললেন লণ্ডনের পেণ্টন বিলা জেলে।

এখানে তাঁর অবস্থিতি ১৭ই আগষ্ট, ১৯০৯ পর্যন্ত—যেদিন তাঁর ফাঁসি হয়। এখানে অবস্থিতি মোট ২৫ দিন। ধীংগরার দুই জেলে মোট অবস্থিতি মাত্র ৪৮ দিন অর্থাৎ দেড় মাসের কিঞ্চিদধিক।

'ইণ্ডিয়া হাউস' থেকে সাভারকর ও আয়ার ব্রিষ্টন জেলে তাঁর সাথে দেখাসাক্ষাৎ করেন। ধীংগরা তাঁর আকাঙ্ক্ষিত আত্মদানের আনন্দে বিভোর হয়ে সুন্দর হাসিমুখে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতেন।

তারপর এল সেই ১৭ই আগষ্ট—যেদিন দেড়মাস কারাভোগের পর প্রভাতে ফাঁসিরে মঞ্চে তাঁর জীবন দেশমাতৃকার পদতলে হ'ল উৎসর্গীকৃত।

সেদিন তাঁর বয়স ছিল মাত্র বাইশ। প্রথম যৌবনের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা ভারতমাতার মুক্তিকল্পে প্রেরণা সৃষ্টির উল্লাসে বিদায় নিল।

॥ তের ॥

ধীংগরার নিন্দাসভা

[জুলাই ৫, ১৯০৯]

৫ই জুলাই, ১৯০৯। লণ্ডনের ক্যাকসটন হল। এই হলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেদিন ভারতীয় রাজভক্ত স্বার্থবাদীদের এক জমকালো সভা। সভায় সাড়ম্বরে উপস্থিত স্যার মংচেরশা ভাবনগরী, কুচবিহারের মহারাজকুমার, স্যার দীনশা পেটিট, আগা খাঁ…

উনি আবার কে? বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নেতা ভারতের জাতীয়তাবাদের জনক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে বাংলার স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং স্যার উপাধিধারী)। বেশ কিন্তু ওঁরা দুজন কেন? ওঁরা ত' নিজেদের উগ্রবাদীরূপে আখ্যায়িত করেন—বিপিন পাল, খাপরণ্ডে!

সভাপতির আসনের দিকে আসছেন সভাপতি আগা খাঁ। আর দামী ছড়ি ঘুরোতে ঘুরোতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন স্যার মংচের শা ভাবনগরী।

মঞ্চে উপবিষ্ট ভারতীয় রাজভক্ত জনগণের প্রতিনিধি—এক একজন টাকার কুমীর। রাজভক্তির প্রসাদে প্রচুর টাকার মালিক! বিলাতের ব্যাঙ্কে জমানো টাকার সুদে সমুদ্রকন্যা লণ্ডননগরীর কোলে বসে সপরিবারে নাচগান খানা পিনায় সুখে কালাতিপাত করছেন।

মহাপ্রভু বৃটিশ রাজের অন্যতম অনুচর উইলির হত্যায় অশ্রু বিসর্জন করতে এবং হত্যাকারী ধীংগরার গালাগালি করে রাজভক্তি

দেখানোর উদ্দেশ্যে এখানে সমবেত। সভাপতি আগা খাঁ—উপযুক্ত ব্যক্তি।

রাজভক্ত ভারতীয়দের ভাষণ চলল কিছুক্ষণ—উইলির মৃত্যুর জন্য দুঃখ প্রকাশ এবং ধীংগরার কটুনিন্দা। এর পর উঠলেন ইণ্ডিয়া কাউনসিলের প্রাক্তন সদস্য থিয়োডোর মরিসন। তাঁর হাতে একখানা চিঠি। চিঠিখানি ধীংগরার দাদার বেনামে অন্য কারও লেখা। চিঠিখানা পড়বার প্রাক্কালে তিনি প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করেন যে ধীংগরার পিতা পাঞ্জাবের যশস্বী ধনী ডাক্তার ও ধীংগরার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধীংগরার সহিত সম্পর্ক অস্বীকার করেছেন (মঞ্চে হর্ষধ্বনি)। এরপর তিনি পড়লেন সেই বেনামী চিঠি।

ভাষণাদির শেষে সভাপতি আগা খাঁ আনলেন প্রস্তাব—

এই সভা ধীংগরা নামক একজন ভারতীয় যুবক ছাত্র কর্তৃক সর্বজনমান্য স্যার কর্জন উইলির কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডের সর্বসম্মতিক্রমে তীব্র নিন্দা প্রকাশ করছেন।

শ্রোতাদের মধ্য থেকে শোনা যায় একটি কণ্ঠ—না, না। 'সর্বসম্মতিক্রমে' না।

সভাপতির আসন থেকে চীৎকার করে উঠেন আগা খাঁ—কে, কে আপনি ? নাম বলুন।

সভাকক্ষে সমবেত ইংরাজ ও টঁ্যাসরা (Anglo-Indian) এক বাক্যে বলে উঠেন—বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান। সভা থেকে বেরিয়ে যান।

স্যার মনচেরশা ভাবনগরী ছড়ি ঘুরোতে ঘুরোতে উঠে পড়েন। প্রহরারত পুলিশদের ডাক দিয়ে বললেন—Search, arrest (তল্লাসী কর, গ্রেপ্তার কর)।

শ্রোতাদের মধ্য থেকে উঠে দাঁড়ালেন বীর সাভারকর। তিনি সংযত ও ভদ্রকণ্ঠে বললেন—আমি বলছি। আমার নাম বিনায়ক দামোদর সাভারকর। আমি ধীংগরার কাজের প্রতিবাদ করি না।

কোথাও কিছু না—কোত্থেকে লাঠি হাতে ছুটে এল ট্যাস পামার। সাভারকরের মাথায় সে এমন লাঠি মারল যে তাঁর মাথা থেকে বার হয় রক্ত। সাভারকর নীরব, নিস্পন্দ কিন্তু দেশভক্তদের মধ্য থেকে থীরুমলাচার্য ছুটে এসে পামারের চুলের মুঠি ধরে দু একটা ঘুষি মারতেই সে মাটিতে পড়ে গেল। আর দেশভক্ত আয়ার কোমর থেকে রিভলবার বার করে ছুটে আসেন ভূপাতিত পামারের দিকে।

রাজভক্তদের সাথে দেশভক্তদের সংঘর্ষ আসন্ন। সাভারকর আয়ারকে বিরত না করলে সেদিন সন্ধ্যায় জাহাঙ্গীর হলের মত ক্যাকসটন হলে হ'ত আর এক কাণ্ড।

এই গোলমালের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি হল থেকে বার হয়ে যান। উত্তপ্ত হলঘর, সদস্যরাও উচ্ছৃঙ্খল। প্রস্তাব আর পাশ হ'ল না। বিনা প্রস্তাবে সভাভঙ্গ করলেন আগা খাঁ।

সাগর পারের বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'টেম্পল ইন'-এর ব্যারিষ্টারী ছাত্র এবং বীর সাভারকরের সহপাঠী। তিনি ঢাকা বিক্রমপুরের পঞ্চসার গ্রামের হায়দরাবাদের নিজাম সরকার (অন্ধ্র)-এ কর্মরত রসায়ণ শাস্ত্রে ডি. এস. সি ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র এবং প্রখ্যাতা দেশভক্ত কবি ও ভারতের 'বুলবুল' সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা।

বীর সাভারকরের উপর লণ্ডনের সাহেব ও ট্যাসদের হামলার প্রতিবাদ করে 'টাইমস্' পত্রিকায় তিনি লিখলেন :

Coercion will drive India headlong to destruction. The catalogue of coming assassination will

probably be a long one and the responsibility for its length will have to be laid at the door of those who



বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

instead of espousing the cause of Indian freedom wish to hold India in the interest of the British.

(অর্থাৎ) [ইংরাজের] দমন-মূলক নীতি ভারতকে হঠকারিতায় চালিত করবে ধ্বংসের পথে। আগামী রাজনৈতিক হত্যার তালিকা হয়ত হবে দীর্ঘ এবং যাঁরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষ অবলম্বন না করে বৃটিশের স্বার্থের জোয়ালে ভারতকে বেঁধে রাখতে চান তাঁরাই হবেন এর জন্য দায়ী।

আশ্চর্য! ভারতের জাতীয়তাবাদের গুরু ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ হয়েও নবীন বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মত ভবিষ্যৎ সত্যকে অনুধাবন করতে পারলেন না।

প্রেস কনফারেন্সে ভারতীয় প্রতিনিধি রূপে তিনি তখন লণ্ডনে। তিনি ধীংগরার অনুষ্ঠিত হত্যাকার্যের জন্য 'ইণ্ডিয়া হাউস' এর প্রতিষ্ঠাতা শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মাকে দায়ী করলেন। হয়ত ১৯০৯ সালেই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইঞ্জিনে দেশপ্রেমের ষ্টিম ফুরিয়ে এসেছিল যার ফলে মাত্র বার বছর পরেই 'জো হুকুম' দলে ভিড়ে তিনি 'চৌষট্টি হাজারী মন্ত্রী' এবং স্যার উপাধিতে বিভূষিত হন। এর জন্য তাঁকে দেশবাসীর নিকট যথেষ্ট লাঞ্ছনা ও দুর্গতি ভোগ করতে হয়েছিল।

একদা যে বাঙালী তাঁকে রাষ্ট্রগুরু আখ্যা দিয়েছিলেন তাঁরাই একদিন তাঁর প্রতিমূর্তি ঘোড়ার গাড়িতে বসিয়ে পিছনে ঘোড়া জুড়ে ঘোড়া পিছনে ছুটিয়েছিলেন।

প্রতিক্রিয়াশীলরা কোনদিনই দেশবাসীর কাছে ক্ষমা পায় না, যতই না তাঁর অতীত কীর্তি থাকুক। অতএব বিপ্লবীগণ, সাবধান! প্রতিক্রিয়াশীলতার পথ থেকে দূরে থাকুন!

ধীংগরার কাজের জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মাকে দায়ী করলেও, এ দোষারোপ অন্যায়। প্যারিস থেকে শ্যামজী 'টাইমস' পত্রিকায় লিখলেন :

Erelong there will be a catastrophy which will stagger humanity unless the British withdraw from India.

অর্থাৎ, বৃটিশ-শক্তি ভারত ত্যাগ না করলে শীঘ্রই এমন একটা বিপর্যয় আসতে পারে যাহা মানবিক আবেদনকে স্তম্ভিত করবে।

বকাটে সাহেব আর পরিচয়হীন ট্যাস আর সেই সাথে বাপকে ভুলে সম্রাটকে যাঁরা বাবা বলেছেন সেই সব ভারতবাসীদের ধীংগরার নিন্দা করবার জন্য কি লম্ফ ঝম্ফ। দ্বেষ আর দালালীতে তাঁরা এতো

পোস্ত যে ধীংগরার আত্মদানের মর্যাদা দেবার মতো তাঁদের ছিল না জ্ঞান, বুদ্ধি ও মন অথচ সেদিন বিখ্যাত গুণী ও উচ্চপদস্থ ইংরাজ আমলা ব্লান্ট (W. S. Blunt) তাঁর ডায়েরীতে কি রকম লিখেছেন শুনুন—

More fearlessness in sacrifice of life and more spirited stand before the judge as shown by Dhingra have never been witnessed in any other martyr.

অর্থাৎ, আত্মদানে ধীংগরা যেরূপ নির্ভীকতা দেখালেন এবং বিচারকের সামনে ধীংগরা যেরূপ সাহসিকতাপূর্ণ ভূমিকা নিলেন তা অন্য কোন শহীদের মধ্যে দেখা যায় নি।

স্যার কর্জন উইলির হত্যা নিয়ে ইংরাজ ও ট্যাঁস ছাড়া বহু ভারতবাসী যে স্বদেশে মাথাব্যথা দেখিয়েছেন তাঁরা শুনলে হতবম্ব হবেন যে উক্ত বিখ্যাত গুণী ইংরাজ আমলা রাজনৈতিক হত্যাকেও সমর্থন করেছেন। তাঁর ডায়েরী থেকে বলছি······

People say political murder retards its cause but it is foolish to say so because it serves to give a strike against the selfish Government and brings to our mind the belief that there is a hint to selfish interest of British Government.

অর্থাৎ, লোকে বলে রাজনৈতিক হত্যা উদ্দেশ্যকে প্রতিহত করে কিন্তু এরূপ বলা বোকামি। কেন না ইহা স্বার্থবাদী সরকারের বিরুদ্ধে আঘাত আনে ও লোকের মনে প্রতীতি জন্মায় যে বৃটিশ সরকারের স্বার্থবাদিতা সম্পর্কে রাজনৈতিক হত্যার ইঙ্গিত আছে।

তাইতো লোকে বলে আসল সাহেব বরং ভালো—নকল সাহেব সারহীন। যাই হ'ক ধীংগরার বৈপ্লবিক কার্য ইণ্ডিয়া আফিসের সাহেবদের মনে আতঙ্ক আনে। ভারত সচিব লর্ড মর্লির বাড়িতে বসল কড়া পাহারা।

॥ চৌদ্দ ॥

দায়রা আদালতে ধীংগরার বিচার

[জুলাই ২৩, ১৯০৯]

বিচারক দায়রা জজ।

কাঠগড়ায় দেশভক্ত মদন লাল ধীংগরা।

ধীংগরার পক্ষে কোন উকিল উপস্থিত ছিলেন না।

ধীংগরা আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন না। জজের প্রশ্নের উত্তরে তিনি শুধু বললেন :

আমাকে নিয়ে আপনারা যা ইচ্ছা করতে পারেন। আমি তার জন্য চিন্তিত নই। আপনারা ইংরাজ—ভারতের দখলকার। অতএব আপনারা সর্বশক্তিমান কিন্তু মনে রাখবেন সামনে অনাগত দিন—যখন চলবে না আপনাদের খামখেয়াল।

সাগরপারের বিচারালয়ে একজন ইংরাজ জজ শুনলেন প্রথম একজন ভারতীয় বন্দীর কাছে যোগ্য প্রত্যুত্তর।

* * * *

পুলিশের বিবরণ এবং সরকারী উকিলের ভাষণের পর জুরিরা একবাক্যে ধীংগরাকে দোষী সাব্যস্ত করলেন আর জজ সাহেব দিলেন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা। মৃত্যু দণ্ডাদেশ পাওয়ার পর ধীংগরার মুখভরা হাসি।

নির্ভীক অবিচল বাইশ বছরের এই তরুণ যুবক মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা পেয়ে বললেন :

আমি আপনার দেশবাসীদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমার গর্ব—আমার জীবন আমার মাতৃভূমির জন্য বলি প্রদত্ত হল। ধন্যবাদ।

মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত বন্দী চললেন পেনটন বিলা জেলে। এই জেলে তাঁর অবস্থিতি ২৩শে জুলাই, ১৯০৯ থেকে ১৭ই আগষ্ট, ১৯০৯ পর্যন্ত।

১৭ই আগষ্ট, ১৯০৯। এই দিন এই জেলার ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিলেন ধীংগরা—সাগরপারের প্রথম শহীদ ধীংগরা।

॥ পনর ॥

ধীংগরার ঘোষণাপত্র

"আমি স্বীকার করছি আমি একজন ইংরাজ রাজপুরুষের রক্তপাত ঘটাতে বদ্ধপরিকর ছিলাম।

এই সঙ্গে আমি একটা কথা বলতে চাই—সেটি হচ্ছে এই যে মাতৃভূমিকে ভালবাসার জন্য বৃটিশ সরকার ভারতীয় তরুণদের যে ভাবে ফাঁসি ও দ্বীপান্তর দিচ্ছেন এটি তার প্রতিবাদ মাত্র।



আমি এই কাজ কারও নির্দেশ বা প্রেরণায় করিনি। একমাত্র আমার বিবেকের কাছে আমি পেয়েছি এই প্রেরণা এবং আমার কি করা উচিত তা অনুভব করেছি।

আমি বেশ বুঝতে পেরেছি যে আমার মাতৃভূমিকে শাসন করছে ইংরেজ বল প্রয়োগ দ্বারা।

এই সামরিক শক্তিতে বলীয়ান ও সঙ্গতিশালী রাজশক্তির সাথে লড়াই করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আমি পিস্তলের মুখে এই রাজশক্তির অনাচারের জবাব দিলাম।

আমি হিন্দু। আমি বিশ্বাস করি মাতৃভূমির অসম্মান স্রষ্টার অসম্মান। মাতৃভূমির সেবা দ্বারা সেই অসম্মান দূরীকরণ হিন্দু হিসাবে আমার কর্তব্য।

আমি অসহায় এবং সঙ্গতিহীন ভারত সন্তান। আমি আত্মদান ছাড়া মাতৃভূমির জন্য কি করতে পারি? তজ্জন্য জননী জন্মভূমির পূজাবেদীমূলে দিতে চাই আমার জীবন অর্ঘ্যস্বরূপ।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের বিচার করে দেখতে হবে—মাতৃভূমির জন্য কি প্রকার উৎসর্গ আমাদের করা কর্তব্য। বিচার করে আমি বুঝতে পেরেছি আমার পক্ষে আত্মোৎসর্গই অবিলম্ব পদক্ষেপ।

দ্বিধাহীন চিত্তে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাই করছি আমি। লড়াই আমাদের তাই—এই হত্যা ও আত্মোৎসর্গ মারফত লড়াই। এই লড়াই আমাদের চলবে যতদিন ভারতে থাকবে বৃটিশ শাসন।

ভগবানের নিকট আমার প্রার্থনা—আমার জন্ম শীঘ্রই যেন ভারতেই হয় এবং মাতৃভূমির মুক্তির জন্য বার বার আত্মোৎসর্গ করতে পারি যতদিন ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান না হয়।"

—মদন লাল ধীংগরা।

ফাঁসির আগেই ধীংগরার ঐতিহাসিক বিবৃতি 'ইণ্ডিয়া হাউস' প্রকাশ করল।

মদন লাল ধীংগরার বিশ্বাসী সাথী 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর জ্ঞানচন্দ্র

বর্মার চেষ্টায় ধীংগরার বয়ান ধীংগরার ফটো সহ প্যারিস থেকে মুদ্রিত হয়।

ভারতীয় তরুণ ছাত্রদের মধ্যে ইহা প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁদের মনে ইহা সৃষ্টি করে একটা ভাবনা—অসহায় অস্ত্রহীন ভারতবাসীর উপর ইংরাজের জুলুমের জবাব কি শুধু পিস্তল? মুক্তি ও স্বাধীনতার পথ কি শুধু আত্মদান? অত্যাচারের প্রতিবাদ কি শুধু হত্যা?

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ভারতীয় বিপ্লবীদের এই ছিল Cult (নীতি)।

ইটালিয়ান ও আইরিশ বিপ্লবী এবং রাশিয়ার নিহিলিষ্টদের ছিল এই হত্যার নীতি—অত্যাচারীর প্রাণনাশ যাকে ইংরাজীতে বলা হয় Cult of Murder.

মারাঠা ও বাংলায় হয় এই নীতির প্রাদুর্ভাব। মারাঠা ও বাংলার মত পাঞ্জাব ও বৈপ্লবিক সংগঠনে একদা ছিল বিশেষ পটু।

পাঞ্জাবের বৈপ্লবিক সংগঠন 'গদর পার্টি'র নাম ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে চিরদিন থাকবে সমুজ্জ্বল।

গদর পার্টি। এর বিশেষ ভূমিকা ছিল বিদ্রোহী সৈনিক-সংগঠন ও বিদ্রোহাত্মক খণ্ড যুদ্ধের সৃষ্টি কিন্তু মারাঠা ও বাংলায় বিপ্লবের ভূমিকা ছিল জবাব ও প্রতিবাদে অত্যাচারী হত্যা ও আত্মদানে জনজাগরণ সৃষ্টি।

হত্যার রাজনীতি দ্বারা স্বাধীনতা আসেনি, আসেও না। স্বাধীনতোত্তর যুগে অনেক বৈপ্লবিক আদর্শ নিয়ে অনেক বৈপ্লবিক দলের আবির্ভাব ঘটে এবং স্বাধীনতোত্তর সরকারের ব্যর্থ শিক্ষা ও খাদ্যনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় এই সব দল ১৯৬৭ সালের পর থেকে রাজনীতিক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকার অধিকারী হয় কিন্তু আজ জনগণের মনের উপর তাদের প্রভাব একপ্রকার বিলুপ্তপ্রায়।

এর কারণ কি? প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র? শুধু তার উপর দোষারোপ করে বসে থাকলে চলবে না। আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন আছে।

সমীক্ষায় দেখা যায় ইজম (আদর্শ) নিয়ে দ্বন্দ্ব উপরোক্ত বৈপ্লবিক দল সমূহের মধ্যে ছিল প্রবল অথচ ইজমের সার্থক সফলতার জন্য একান্ত প্রয়োজনয়ী পারস্পরিক বুঝাপড়া ও ঐকাত্ম্য বোধের ছিল রহস্যজনক অভাব।

নেতাদের আদর্শনিষ্ঠা ও সদিচ্ছায় আমরা সন্দিহান নই কিন্তু দলের সম্প্রসারণের খাতিরে অবাঞ্ছিত লোকদের অনুপ্রবেশ এবং উচ্চ আদর্শের সুমহান্ পতাকা তলে স্বার্থবাদীদের সমাবেশ সম্পর্কে নিজেদের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না।

এ কথা কি আমরা ভুলতে পারি সুমহান্ চিন্তাশীল ও কর্মনায়ক লেনিন, মাও ও লোহিয়ার নাম করে এই পবিত্র বাংলার মাটিতে ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করবার জন্য হত্যার সংঘটন করান হয়েছে, কুপ্রবৃত্তি ও কু-লালসার বশে অসহায় নারীর সর্বনাশ আনা হয়েছে এবং উপগোষ্ঠীর অর্থ লিপ্সার আবেদনে ওয়াগানভাঙা, তার কাটা, শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষদের ট্রেনের কক্ষে যথাসর্বস্ব লুট, ব্যাঙ্ক ডাকাতি ইত্যাদির হয়েছে অবতারণা।

প্রয়োজন যেখানে হীন, উদ্দেশ্য যেখানে কলুষিত সেখানে এসব কাজকে বিপ্লববাদের অঙ্গ হিসাবে আখ্যায়িত করতে আমরা কুণ্ঠিত।

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সাথে ১৯৬৯-৭১ সাল মধ্যে অনুষ্ঠিত কর্মকাণ্ডের কোনরূপ অনুরূপতা আছে একথা যদি কেউ মনে করেন তা হ'লে ভারতের বিপ্লববাদের গতি, প্রকৃতি ও ধারা সম্বন্ধে অপব্যাখ্যা হবে।

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের বিপ্লববাদে হত্যার মূল্য ছিল অনবদ্য। প্রয়োজন সামগ্রিক—দেশ ও দেশবাসীর উপর অত্যাচারী দুশমনদের

মৃত্যুদণ্ড এবং আবেদন মহান ও শুদ্ধ—নিঃস্বার্থ আত্মদান মারফত জন জাগরণ সৃষ্টি।

জালিয়াওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর মহাত্মা গান্ধী যখন ভারতের মুক্তি সংগ্রামের নায়কত্ব গ্রহণ করলেন তখন মারাঠা—বাংলা—পাঞ্জাবের শত শত শহীদের রক্তে রাঙা এই জনজাগরণ ভারতের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে ছিল বিরাট এক মূলধন।

সাভারকর-ধীংগরার Cult of murder (হত্যানীতি)-এর মূল্যায়নে আমরা ভারতীয় বিপ্লববাদের উপরোক্ত সদব্যাখ্যা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অবহিত হব।

বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য ইংরাজ ও তার 'জো হুকুমের দল' একে মিছামিছি নাম দিয়েছেন 'সন্ত্রাসবাদ' (Terrorism)। সন্ত্রাসবাদের নায়ক বিদেশী শাসক ও শোষক ইংরাজ।

সন্ত্রাসবাদী শাসনে ইংরাজ ভারতকে দুই শতাব্দীকাল পদানত করেছিল। সেই ইংরাজের ফাঁসি, দ্বীপান্তর, গুলি, লাঠি, বেত-ই সন্ত্রাসবাদ—ভারতের বিপ্লববাদ বিরাট এক দর্শন—ঠুনকো সামান্য সন্ত্রাসবাদ নয়।

ভারতের বিপ্লববাদের এই বিরাটত্বের সামিল হতে পারে নি স্বাধীনতোত্তর বৈপ্লবিক দলগুলি। এই দলগুলির আদর্শ ও কর্মপন্থার পিছনে আছে লেনিন কিংবা মাও কিংবা লোহিয়ার দর্শন।

লেনিনের রাশিয়া এবং মাও-এর চীন বিপ্লবকালে যে পরিবেশ, পরিস্থিতি ও গণসংগঠনের সমস্যার অধিকারী ছিল তাহা এখন পরিবর্তিত। বর্তমানকালীন পরিবেশ, পরিস্থিতি ও গণসংগঠনের সমস্যা যে ভিন্ন তাহা অনুধাবন না করেই উপরোক্ত দলগুলি রাশিয়া ও চীন বিপ্লবের মত বিপ্লব ভারতে আমদানি করতে প্রয়াসী হয়,

কোন্ লাইনে জোট বাঁধলে এবং কাজ করলে ভারতে শ্রেণীদ্বন্দ্ব-বিপ্লবের পথ তৈরী হতে পারে তা আবিষ্কারে প্রয়াসী হয় নি। উপরন্তু দল সম্প্রসারণ ও অগ্রাসন এবং গ্রাসনীতির ফলে স্বাধীনতোত্তর ঐ বৈপ্লবিক দলগুলির শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিপ্লব মাঠে মারা যায় এবং দলাদলি দেশে এমন এক হত্যার রাজনীতির সূচনা (১৯৬৯-৭১) হয় যাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের পক্ষে হয়েছিল ভাবনার বিষয়।

হত্যার রাজনীতি কেন? সর্বহারা বিপ্লব সংগঠন সোজা ব্যাপার নয়। সর্বহারার হাতেই হয় সর্বহারার বিপ্লব।

রাশিয়ার বিপ্লব ঘটাল রাশিয়ার মজুর, চীনের বিপ্লব ঘটাল চীনের কৃষক। উভয় ক্ষেত্রে কিন্তু নেতৃত্ব দিয়েছেন মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শ্রেণীত্যাগী লোকরা।

এই মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের সম্বন্ধে লেনিন বলেছেন—এরা না শোষক, না শোষিত। ত্রিশঙ্কুর মত—না স্বর্গে, না নরকে। বিপ্লব সম্পাদনে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত-এর দোদুল্যমান মনোভাব স্বীকৃত বিষয়।

কিন্তু সর্বহারাদের সব বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছেন মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের লোকরাই।

তাই পরবর্তী কালে সর্বহারা ঘরের মানুষ স্ট্যালিন বললেন—মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত লোক সর্বহারা বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম তখনই যখন—

১। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত লোক শ্রেণীত্যাগী হয় অর্থাৎ, নিজ শ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়,

২। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত লোক শোষিত মজুর ও কৃষকের স্বার্থের সাথে একাত্ম হয়।

১৯৬৯-৭১ সালের বাংলায় তথাকথিত বৈপ্লবিক দলগুলির তথাকথিত বিপ্লব আন্দোলনে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত লোকেরই সমাবেশ হয় কিন্তু তাঁরা নিজ শ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীও হতে পারেন নি এবং শোষিত কৃষক মজুরের স্বার্থের সাথে একাত্ম হ'তে পারেন নি।

ফলে ১৯৬৯-৭১ সালের বাংলার তথাকথিত বৈপ্লবিক আন্দোলন বাংলায় সর্বহারা বিপ্লবের উত্তাপ সৃষ্টি করতে পারে নি। পরন্তু স্বার্থবাদী, সমাজবিরোধী, বেকার এবং তত্ত্ববিলাসীদের সমাবেশে বৈপ্লবিক ব্যর্থতা, দলাদলি হানাহানির মত্ততার নেশায় নেতাদের ও কর্মীদের আত্মগ্লানির হাত থেকে মুক্তি দিল।

হানাহানি হ'ল নেতা ও কর্মীদের আত্মগ্লানির মুক্তি। মস্তানী মেজাজ বিপ্লবের মরা গাঙে হ'ল চাঙা। সুরু হ'ল হত্যার রাজনীতি।

রাজনীতি বলব কিনা জানি না? নিছক হত্যাও বলতে পারি না। বলতে পারি দলবিরোধী, দলছুট, বেইমান দুষমন হত্যা অথবা হত্যার বদলা হত্যা। ক'ত অঞ্চল উপদ্রুত। তিন বছর সে সব অঞ্চলে পা দিতে পারি নি। এখন নিরাপদে যাচ্ছি এবং ফিরছিও নিরাপদে। নব কংগ্রেসের কল্যানে আজ তা হয়েছে সম্ভব।

থমকে দাঁড়াই রাস্তার মোড়ে। স্মৃতিফলকে লেখা কত কিশোরের নাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি। বিকৃত বিপ্লবের হতভাগ্য বলি। পার্টিবাজি, মস্তানী মেজাজ, আঞ্চলিক আধিপত্যের হাঙ্গামার শিকার। ঠুনকো সামান্য সন্ত্রাসবাদের হাতে ভারতীয় বিপ্লববাদের বিরাটত্বের অপচয়। হতভাগ্য কিশোর, তোমাদের অপমৃত্যুর কথা আমাদের লেখনী ভুলবে না কোনদিন।

শিবাজীর দেশ মারাঠায় Cult of murder এর প্রথম সূচনা। বাংলায় আসে মারাঠার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। তিলক এর পরোক্ষ সমর্থক। বাংলায় এর সূচনাকারী শ্রীঅরবিন্দ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সাগরপারে এর প্রবক্তা 'ইণ্ডিয়া হাউস'। এই 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর কর্মকর্তা ব্যারিষ্টারী ছাত্র সাভারকরের হাতে গড়া ছেলে ধীংগরা রাজভক্তনিন্দিত Cult of murder কে দাঁড় করালেন এক মহান্ সৌন্দর্যময় তত্ত্বের উপর। যার ফলে বিশ্বের—এমন কি ইংলণ্ডেরও—বিবেকবান ব্যক্তিরাও এই Cult এর অপরিহার্য ও অনিবার্য প্রয়োগকে দিয়েছেন স্বীকৃতি এবং পরবর্তী ভারতবর্ষ ভারতের মুক্তির জন্য একেই হাতিয়াররূপে গ্রহণ করেছে।

॥ ষোল ॥

ফাঁসীর ইতিহাসঃ ভারতবর্ষ

ফাঁসির প্রথম বলি বাঙালী—বাংলার মহারাজ নন্দকুমার। বাংলার নবাব মীরজাফর ও তৎপুত্র নিজামের দেওয়ান নন্দকুমার। সিরাজের আমলে তিনি ছিলেন হুগলীর ফৌজদার।

ক্লাইভ পরিচালিত ইংরাজ বণিকদের একটানা সর্বাঙ্গীন শোষণের ভয়াবহ পরিণাম—মহাশ্মশান বাংলা…

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে (১৭৭০) বাংলার মহাশ্মশানে ইংরাজ বণিকদের চালের কালোবাজারের প্রতিবাদে হেষ্টিংসের সাজানো জালিয়াতির মামলায় ফাঁসিতে ঝুললেন নিষ্ঠাবান ধার্মিক ব্রাহ্মণ মহারাজ নন্দকুমার—৫ই আগষ্ট, ১৭৭৫।

কলকাতার ফাঁসির গলি ফ্যান্‌সি লেনের সেই গাছটা আজ নেই—যে গাছের ডালে নন্দকুমারের হয়েছিল ফাঁসি!

* * * *

তারপর …১৭৬৭, ১৭৯৮

গাছের ডালে লটকানো ফাঁসির বলি মেদিনীপুরের জঙ্গলমহলের জায়গীরচ্যুত বিদ্রোহী বণ্যাচুয়াড়—অগণিত। কাঁসাই নদীর দুই তীরে জঙ্গল গাছের পাতায় পাতায় আজও শুনতে পাই এদের শেষ দীর্ঘশ্বাস।

আর সেই স্মৃতি নিয়ে তাদের রাণী—রাণী শিরোমণির আবাসগড়ের দীঘির জলে আত্মহত্যা আজও এক প্রচলিত শোকাবহ কাহিনীর গানে রাণীর রাজরাজেশ্বরীর মন্দিরে প্রজ্বলিত দীপ অচঞ্চল……

তারপর…১৮০৬-১৮১৬ সাল।

গাছের ডালে লটকানো ফাঁসের বলি উত্তর মেদিনীপুরের বগড়ির ভূমিচ্যুত সতরজন নায়েক দলপতি ও বিদ্রোহী নায়ক অচল সিংহ।

শীলাবতীর তীরে অরণ্যের পর গণগণির মাঠে পাথরে আঁকা সেই আত্মত্যাগের কাহিনী আর গাছের দোদুল্যমান শাখায় নিন্দার ঝড়ে পরিত্যক্ত ইংরাজের দালাল বিশ্বাসঘাতক বগড়িরাজ ছত্র সিংহের রাজবাটি।

তারপর…১৮৫৬ সাল।

ইংরাজের সাহায্যপুষ্ট ধনিক ও জমিদারের শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী দশ হাজার সাঁওতাল ও সাঁওতাল নায়ক সীহু গাছের ডালে লটকানো ফাঁসের বলি। বসন্তের প্রথম হাওয়ায় শাল অর্জুনের ডালে ডালে ফাঁসির দড়িতে দোদুল্যমান বিদ্রোহী সাঁওতালদের শব। আচমকা থেমে যায় মহুয়ার বনের ছায়ায় মাদল আর উতাল নাচের তাল।

তারপর…১৮৫৭ সাল।

এবার সিপাহী বিদ্রোহ।

এবারও সেই বাংলা :

বাংলার বারাকপুর। বারাকপুরে ছিল ৪৭ নং ফৌজ। এই ফৌজের মঙ্গল পাণ্ডে ছোড়েন বিদ্রোহের প্রথম গুলি। তাই ইংরাজরা বিদ্রোহীদের বলত পাণ্ডিয়া।

মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে সিপাইরা নিহত করল গোরা অফিসার, কাটল টেলিগ্রামের তার—কণ্ঠে বিদ্রোহের গান। ধৃত পাণ্ডিয়াদের গাছের ডালে ইংরাজরা দেয় ফাঁসি।

বাংলার চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম সীমান্ত রক্ষায় নিযুক্ত ছিল ৩৪ সংখ্যক পদাতিক সৈন্যের তৃতীয় ও চতুর্থ দল। এই দুই দলের বিদ্রোহী সিপাইরা খুলে দিল জেলখানা, লুট করল রাজকোষ।

কারামুক্ত কয়েদী ও স্ত্রীপুত্র সহ তারা সংখ্যায় ছিল পাঁচশত। পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরে বিদ্রোহী সিপাইরা ধরা পড়ল। চট্টগ্রামে তাদের ফাঁসি হয়।

ইংরাজ-শোণিতে মধ্য ও উত্তর ভারতের মাটি তখন পিছল।... ইংরাজের ঘাঁটি ও দুর্গ ভূলুণ্ঠিত......

বিদ্রোহী সিপাইদের অধিকারে এল ভারতের রাজধানী দিল্লী।

বিদ্রোহীরা দিল্লীর সিংহাসনে বসাল বাহাদুর শা-কে—দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট।

জলপথে আসে বিলাত থেকে ইংরাজসৈন্য আর আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র...

প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য বিদ্রোহীরা বুকের রক্ত দিয়ে করল সংগ্রাম।...বিদ্রোহীদের হ'ল পরাজয়...

অন্যতম বিদ্রোহী নেতা তাঁতিয়া তোপের হ'ল ফাঁসি।

আর সব নায়করা ?

নানা সাহেব নেপালের বনে পলাতক।...

ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই সম্মুখ সমরে দিলেন প্রাণবিসর্জন।...

বাহাদুর শাহ—রেঙ্গুনে নির্বাসিত...

নির্বাসিত রাজপুতানার প্রিন্স কুমার সিংহ আর ফৈজাবাদের মৌলবি আহম্মদ শা।

অবরুদ্ধ রাজধানী দিল্লীর একটি দ্বিপ্রহর :

ঘরে ঘরে জলন্ত উনানে ভাতের হাঁড়ি।

মা-বোন-স্ত্রীর আলিঙ্গন থেকে কেড়ে নিয়ে গেল প্রতিশোধের স্পৃহায় সক্ষম পুরুষদের গোরা সৈন্যরা। সারিবদ্ধভাবে তাদের দাঁড় করিয়ে তাদের বুকে ছুড়ল গুলি। গুলি ফুরিয়ে গেলে অবশিষ্টদের প্রকাশ্য রাজপথে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিল।

মরল দশহাজার ভারতবাসী। বলা বাহুল্য অধিকাংশই নবাব-প্রাসাদের সহিত সংশ্লিষ্ট দিল্লীর মুসলমান।

* * * *

ফাঁসির ইতিহাসে অবান্তর হলেও আমরা ভুলতে পারি না বাংলার নীলবিদ্রোহ (১৮৫৮) ও মহারাষ্ট্রের রামোশী বিদ্রোহ (১৮৭১) ও ফাড়কের বিদ্রোহ (১৮৭৯)।

নীলবিদ্রোহ নীলকর সাহেবদের শোষণ, জালিয়াতি এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে নীলচাষীদের অভ্যুত্থান এবং লড়াই। বাংলার চাষী আর মধ্যবিত্তের এই মিলিত সংগ্রামে সংগ্রামশীল জাতীয়তা-বোধের আবির্ভাব হয়…

রামেশী বিদ্রোহ। মহারাষ্ট্রের সাময়িক বাহিনীর লোক মহারাষ্ট্রীয় উপজাতি রামোশীদের বিদ্রোহ। বিদ্রোহী রামোশী উপজাতির লোক দৌলতরাও রামোশী ও তাঁর বিশ্বস্ত সাথী গোবিন্দ রাও ধাবাড়ের সহযোগিতায় বাসুদেও বলবন্ত ফাড়কে (১৮৪৫—ফেব্রুয়ারি ১৭, ১৮৮৩) শিবাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতে বৃটিশ রাজত্বের অবসানের প্রচেষ্টা করেন এবং এতদুদ্দেশ্যে গঠন করেন বিরাট এক গেরিলা বাহিনী। বিক্ষুব্ধ রোহিলা যোদ্ধৃগণ এবং নিজাম রাজ্যের সংগ্রামপ্রিয় পাঠানরা এই গেরিলা বাহিনীতে যোগদান করেন। ইংরাজ সৈন্যদলের সহিত খণ্ড যুদ্ধে সেনাপতি দৌলতরাও রামোশী প্রাণ হারান। বিশ্বাসঘাতকের সংবাদে হায়দরাবাদ জেলার কালাদগির মন্দিরে ফাড়কে ইংরাজ সৈন্যদলের হাতে ৩রা জুলাই ১৮৭৯ সালে ধৃত হন। বৃটিশের লবণ-বন্দর এডেনে তাঁকে আটক রাখা হয়। বীর ফাড়কে এই সুরক্ষিত কারাগার থেকে পলায়ন করেন কিন্তু আবার ধৃত হন। এডেনে নির্বাসন কালে এই বীরের মৃত্যু হয়—১৮৮৩ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী। কুকা উপজাতি (লুধিয়ানা)-র বিদ্রোহ (১৮৭২) ফাঁসির ইতিহাসে কিন্তু অবান্তর

নয়—কেন না বৃটিশ ফৌজ ধৃত ও বন্দী বিদ্রোহীদের ফাঁসি দিয়েছিল।

১৮৭২ সালের জানুয়ারী মাস। তারিখ পনর থেকে সতর। কুকা উপজাতির লোকেরা বিদ্রোহী হয়। তারা অধিকার করে বসে দু-দুটো দুর্গ—ম্যালড আর শিরহিন্দ দুর্গ। তারপর তারা মালার-কোটলা দখল করে ট্রেজারি হস্তগত করে। অমানুষিক নির্যাতনে এই বিদ্রোহ দমিত হয়।

এবার মণিপুর (১৮৯০-৯১) ··· তারপর রাঁচী (১৮৯৯-১৯০০) রাঁচীতে বীরশার নেতৃত্বে মুণ্ডাদের বিদ্রোহ হয়। উল্লেখযোগ্য—সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ সিং-এর নেতৃত্বে মণিপুরের বিদ্রোহ। জেনারেল থেনগলের সাথে সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ সিং-এর ফাঁসি হয়—আগষ্ট ১৩, ১৮৯১। আর নয়। চলুন্ মহারাষ্ট্রে এবার—তিলকের মারাঠাদেশে।

২২শে জুন, ১৮৯৭।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলি উৎসব।

রাত্রি সাড়ে এগারটার পর পর দু'খানি গাড়ি লাটভবনের গেট দিয়ে বার হয়। একখানায় প্লেগ কমিশনার র‍্যাণ্ডে আর একখানায় পত্নীসহ সামরিক কর্মচারী লেঃ আর্নেষ্ট। অন্ধকার মধ্যরাত্রি। সহসা মৃদু আওয়াজ হয়।

সংকেত ধ্বনি করেন বালকৃষ্ণ চাপেকার।

বালকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দামোদর চাপেকার র‍্যাণ্ডের গাড়ির পিছনে উঠে র‍্যাণ্ডের পিঠে ছুড়লেন গুলি। আহত হলেন র‍্যাণ্ড। বিনায়ক রাণাডের গুলিতে নিহত হলেন সামরিক কর্মচারী লেপ্টান্যাণ্ট আর্নেষ্ট।

৩রা জুলাই (১৮৯৭) এ হাসপাতালে র‍্যাণ্ডের হ'ল জীবনাবসান

এবং প্লেগ মহামারীর সুযোগে পুণার মানুষদের উপর যে নৃশংস অত্যাচার সংঘটিত হচ্ছিল এর উপর পড়ল যবনিকা।

* * *

দেড়মাস পরে দামোদর ধৃত হন এবং বিচারের প্রহসনে ফাঁসির হুকুম হয়।

১৮ই এপ্রিল, ১৮৯৮। হাসিমুখে ফাঁসির রজ্জু স্পর্শ করলেন দামোদর চাপেকার।

পুণার চাপেকার শ্রেণীর নিষ্ঠাবান ভক্ত ব্রাহ্মণ হরিপন্থ। এঁরই প্রথম পুত্র শহীদ দামোদর।

দ্বিতীয় পুত্র বালকৃষ্ণ। পুলিশ তাঁকে খোঁজ করে।

হায়দরাবাদে পলাতক অবস্থায় থাকা কালীন দুই 'দ্রাবিড়' ভাই-এর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বালকৃষ্ণ পুলিশের হাতে বন্দী হলেন। ইতিমধ্যে আসামীর কাঠগড়ায় এসেছেন বিনায়ক রাণাডে। বিচার চলে ... ...

* * *

৮ই-ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৯। হরিপন্থের তৃতীয় বা সর্বকনিষ্ঠ পুত্র বাসুদেব রাত্রিকালে ছদ্মবেশে দ্রাবিড় ভাইদের বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হন।

'কি চাই?'

'বড় রাস্তায় পুলিশ সাহেব গাড়িতে বসে আছেন। তোমাদের দেখা করতে বললেন।"

খবর দিয়ে বাইরে চলে গেলেন বাসুদেব। দ্রাবিড় ভাইদের বাড়ির বাইরে এসে তিনি আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকেন।

দুই ভাই দ্রাবিড় সেখানে আসতেই বাসুদেবের হাতের পিস্তল গর্জে উঠল। এক ভাইয়ের প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল আর এক ভাই হাত জোড় করে বলল—এ কি?

উত্তর হল : বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার।

আবার গর্জে উঠল কিশোর বাসুদেবের হাতের অগ্নিনালিকা।

লক্ষ্য অব্যর্থ।

*　　　　*　　　　*

পুলিশ বাসুদেবকেই সন্দেহ করল। থানায় বাসুদেবের জেরা হচ্ছে···

এমন সময় একদিন···

সেদিন ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৯।

বাসুদেব রিভালবার বার করে পুলিশসাহেবের দিকে লক্ষ্য করেন। সাহেবের ধাক্কায় কিশোরের হাতের রিভলবার পড়ে যায়। বন্দী হলেন বাসুদেব।

···　　···　　···　　···

বিচার চলে। বিচারের নামে প্রহসন।

৮ই মার্চ, ১৮৯৯। শহীদ দামোদরের ভ্রাতা বালকৃষ্ণের হল' ফাঁসির হুকুম। বালকৃষ্ণ নরহত্যা করেন নি। তবু তাঁরও ফাঁসির হুকুম হয়।

অপরাধ নরহত্যায় নাকি সহায়তা। অতএব দণ্ড মৃত্যু।

ফাঁসির হুকুম পেলেন রাণাডে। ফাঁসির হুকুম পেলেন বাসুদেব। বাসুদেবের ফাঁসি হল আগে—৮ই মে, ১৮৯৯।

১০ই মে, ১৮৯৯। ফাঁসির মঞ্চে উঠলেন বিনায়ক রাণাডে।

১১ই মে, ১৮৯৯। মধ্যম চাপেকার বালকৃষ্ণের শেষ দিন।

চাপেকার ভ্রাতৃত্রয় আর বিনায়ক রাণাডের তাজা রক্ত লিখে দিল অত্যাচারী আর বিশ্বাসঘাতকের পরোয়ানা—মৃত্যুদণ্ড।

হরিপন্থ চাপেকারের গৃহ শূন্য। তবুও হরিপন্থ পত্নীর চক্ষু অশ্রুহীন। ভগিনী নিবেদিতা তাঁকে সান্ত্বনা দিতে এলে তিনি

বললেন—আমার কোন দুঃখ নেই। আমি তিন শহীদের জননী। এ ত' আমার গৌরব।

এবার বাংলা।

৩০শে এপ্রিল, (১৯০৮)। সন্ধ্যাবেলা।

কলকাতার অত্যাচারী প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেবের মজঃফরপুরস্থ বাংলোর সামনে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন বাংলার দুই কিশোর বিপ্লবী—ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী।

সহসা অদূরে কিংসফোর্ড সাহেবের গাড়ির খট খট আওয়াজ।

তড়িৎবেগে বিপ্লবীরা প্রস্তুত হন। গাড়ির উপর বোমা ফেলে তাঁরা পরস্পর বিপরীত দিকে প্রস্থান করেন।

সৌভাগ্যবান কিংসফোর্ড সে গাড়িতে ছিলেন না—ছিলেন ব্যারিষ্টার কেনেডির পত্নী ও কন্যা। প্রাণ হারালেন তারা।

* * * *

অন্ধকার রাত্রি। বিদেশ। অচেনা, অন্ধকার পথ। সারারাত্রি পথ হেঁটে চলেছেন ক্ষুদিরাম। পথশ্রমে পরিশ্রান্ত, শুষ্ক মুখ। সারা রাত পথ হাঁটলেন। রাত ভোর হ'ল।

বেলা বাড়ে। ক্ষুদিরাম ওয়াইনি ষ্টেশনের নিকটে একটি দোকানে এসে বসে পড়লেন। গুড় মুড়ি খেয়ে জল পান করছেন—এমন সময় সাদা পোষাক পরা ষ্টেশনের পাহারাদার পুলিশ সন্দেহবশতঃ তাঁকে গ্রেপ্তার করল।

গুপ্ত সমিতির খবরাখবর জানবার জন্য পুলিশ তাঁর উপর অসীম নির্যাতন করল। ক্ষুদিরাম আদর্শ বিপ্লবী। তার কাছ থেকে একটি কথাও বার হল না।

এগার-ই আগষ্ট (১৯০৮)। শ্রাবণ মাস। বাংলার আকাশে বর্ষা

অঝোরে চোখের জল ফেলে বাংলার মাঠ, ঘাট ও বাটে। সেদিন লাঞ্ছিতা বঙ্গজননীর চোখের জল মুছে দিবার বকৃশিস নিচ্ছিলেন মজঃফরপুরের কারাগারে ফাঁসির মঞ্চে কিশোর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম।

শোকে উথলে উঠল গণ্ডকী নদীর জল। গণ্ডকীর বালুচরে ভস্ম হ'ল ক্ষুদিরামের দেহ।

গ্রাম-গ্রামান্তরে বাংলার মাঠে প্রান্তরে সেদিন খেয়ালী বাউলের কণ্ঠে যে গানের সূত্রপাত হয় তা আজও বাংলার ঘরে ঘরে কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হয়—

এবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি—
ক্ষুদিরামের হবে ফাঁসি।

* * * *

আর প্রফুল্ল। প্রফুল্ল তখন কোথায় ?

১লা মে, ১৯০৮। মোকামাঘাটের ষ্টেশনের প্লাটফর্মের সিমেন্টের উপর তাঁর জীবন নাট্যের হ'ল যবনিকা পাত।

প্রফুল্ল চাকী ছিলেন না ক্ষুদিরামের মত খেয়ালী। তাঁর বয়স ছিল আরও কম। প্রফুল্ল সতের বছর বয়সের কিশোর। তিনি সোজা ট্রেনে চেপে সেদিনই রাত্রির অন্ধকারে কলকাতার পথে যাত্রা করলেন। মাঝে সমস্তিপুর ষ্টেশন। এখানে ট্রেন বদল করতে হয়। সমস্তিপুর ষ্টেশনে প্রফুল্ল জামা কাপড় বদল করছেন। নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক সি, আই, ডি ইনস্পেকটরের চোখে পড়ল তা। প্রফুল্লের পিছু নিলেন তিনি।

ট্রেন আবার চলে। নন্দলাল প্রফুল্ল চাকীর কামরায় উঠে তার সঙ্গে ভাব করেন। মোকামাঘাটে নেমে প্রফুল্ল চাকী দেখলেন একদল পুলিশ নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে উদ্যত।

পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণ করা হেয় মনে করলেন প্রফুল্ল

চাকী। কোমরের রিভলবার মুখের মধ্যে পুরে তিনি ছুড়লেন গুলি। বিপ্লবীর জীবন্ত দেহ স্বদেশীয় বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহীর স্পর্শের যে কত উপরে তা দেখিয়ে তিনি বীরের মত মৃত্যু বরণ করলেন।

··· মোকামাঘাট ষ্টেশনের প্লাটফর্ম—বাঙালীর তীর্থ, স্বাধীন ভারতের মুক্তির পীঠস্থান। বাংলার প্রথম শহীদের তুহিন শীতল দেহের স্পর্শে কেঁদে উঠেছিল একদিন এখানকায় সিমেন্ট—কাঁপেনি ইংরাজের পদলেহী বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচরের প্রাণ। যে শিক্ষা পলাশীর মাঠে আমরা পাই সেই শিক্ষা আমরা সেদিন পেলাম মোকামাঘাটের প্লাটফর্মে। সেদিন সিরাজ হেরেছেন, মীরজাফর মাথায় পরেছেন রাজমুকুট। এদিন ১লা মে (১৯০৮) সেই গঙ্গার তীরে প্রফুল্ল চাকী মরলেন আর পুরস্কার পেলেন নন্দলাল।

কিন্তু ইতিহাসের পাতায় এটাই কি সত্য? বিপরীত কি সত্য কিছুই নাই?

আছে। দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকদের কোনদিন কেউ দেয়নি রেহাই। বিপ্লবীদের উদ্যত অগ্নিনালিকার মুখে বিশ্বাসঘাতকতার জবাব এসেছে—ক্ষমা নেই।

নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও পাননি ক্ষমা। মাত্র চার মাস পর —১৯০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের এক সন্ধ্যায়—বৌবাজার আর সারপেনটাইন লেনের মোড়ে নন্দলালের রক্তে শহীদ প্রফুল্ল চাকীর স্মৃতি তর্পণ করলেন অজ্ঞাতনামা এক বিপ্লবী।

১৯০৮ সালের এই সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিন আর এক বিশ্বাস-ঘাতক পেলেন বিশ্বাসঘাতকতার জবাব। তিনি আলিপুর বোমার মামলার (১৯ মে, ১৯০৮—১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৮) রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাই। শ্রীরামপুর (হুগলী)-এর ধনী জমিদার গোস্বামী পরিবারের কুসন্তান সুদর্শন তরুণ যুবক নরেন গোঁসাই। আলিপুর জেলের হাসপাতালে এই বিশ্বাসঘাতককে রিভলবারের গুলিতে নিহত

করে ফাঁসীর মঞ্চে উঠলেন চন্দননগরের কানাই দত্ত ও মেদিনীপুরের সত্যেন বসু। বিপ্লববাদের ইতিহাসে এ এক অপূর্ব রোমাঞ্চকর ঘটনা।

কানাইলাল (১০ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৭—১০ নবেম্বর, ১৯০৮): কংসের কারাগারে যেদিন শিশু শ্রীকৃষ্ণ অত্যাচারী নিধনের জন্য জন্মগ্রহণ করেন সেই পুত জন্মাষ্টমীর দিনে ১৮৮৭ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে চন্দননগরে জন্মগ্রহণ করেন ফাঁসীর শহীদ কানাই লাল দত্ত। কানাইলাল ছিলেন খুব ভাল ছাত্র। আহারে, বিহারে, চাল-চলনে তিনি ছিলেন সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। পরদুঃখ-কাতরতা ছিল তাঁর অন্যতম গুণ।

চোখে মুখে দীপ্ত ছিল তাঁর অনাসক্ত কর্মীর ভাব। আদর্শ বিপ্লবী কানাইলাল সহকর্মীদের বাঁচাবার আকুল আগ্রহে বিশ্বাস-ঘাতকতার সমুচিত জবাব দিতে ফাঁসীর মঞ্চে প্রাণ দিলেন ১৯০৮ সালের ১০ই নভেম্বর উষায়।

একুশ বছর বয়সের ছেলের সে কি অসীম সাহস। সেই বয়সে তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন গীতার মর্ম—আত্মা অবিনশ্বর।

ফাঁসীর হুকুম শুনে তাঁর ভয় হয়নি—আনন্দে বৃদ্ধি পেয়েছিল তাঁর দেহের ওজন। ফাঁসীমঞ্চে নিয়ে যাবার একটু আগে দেখা গেল অকাতরে ঘুমোচ্ছেন তিনি। হাসিমুখে তিনি গলায় পরলেন ফাসির রজ্জু। এই ত মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের মৃত্যু।

উন্মত্ত জনতা কানাই-এর মৃতদেহ নিয়ে চলল শ্মশানে। গীতা আর ফুলের মালায় ভরে গেল শবাধার। কানাই-এর ভস্ম নিয়ে পড়ে গেল কাড়াকাড়ি। মরণে তিনি জাগালেন সারা দেশ। কানাই-এর শব মিছিলে জনসাধারণের উন্মত্ত উদ্দীপনা দেখে সরকার সত্যেনের শব কারাগারে দাহ করবার ব্যবস্থা করলেন।

*　　*　　*　　*

সত্যেন্দ্রনাথ (৩০শে জুলাই. ১৮৮২—২১ নভেম্বর, ১৯০৮)। ১৮৮২ সালের ৩০শে জুলাই রাখিপূর্ণিমা তিথিতে সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম। স্বাদেশিকতার প্রবর্তক রাজনারায়ণ বসুর তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁর স্বাস্থ্য ছিল বরাবর খারাপ কিন্তু তবুও তিনি ছিলেন কর্মঠ কর্মী।

১৯০৮ সালের ২১শে ডিসেম্বর ফাঁসির মঞ্চে তিনি—স্বদেশ মুক্তির কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন করলেন।

সরকার সত্যেনের শব কারাগারে দাহ করবার ব্যবস্থা করলেন। কলকাতার জনসাধারণ তাঁর কুশপুত্তলিকা নিয়ে মিছিল করতে উদ্যোগী হলেন। সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে তাও বন্ধ করলেন। নীরব বুকে সত্যেনের মর্মান্তিক স্মৃতি জাগ্রত হ'ল।

*　　*　　*　　*

ভীরু কাপুরুষ বাঙালী মরে অনাহারে—রোগে, শোকে, দুঃখে মরার মত মরতে জানত না।

মুক্তি সাধনার মরণ-যজ্ঞে সেদিন ১৯০৮ সালে মরার মত মরতে শিখল বাঙ্গালী—প্রফুল্ল, ক্ষুদিরাম, সত্যেন।

এক……দুই……তিন……চার

মরার পালা হ'ল সুরু।

উথলে উঠল সাগরের জল।

লণ্ডনে—সাগর পারে—তৈরী হচ্ছে সেদিন ভারতীয় বিপ্লবীদের জন্য ফাসির মঞ্চ।

সাগর পারে লণ্ডনে পেনটনবিলা সেলের ফাঁসির মঞ্চে নামছে ফাঁসির রজ্জু। সেই রজ্জুকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন পেনটন বিলা জেলের মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত বন্দী।

সাগর পারের প্রথম শহীদ "ধীংগরা।"

॥ সতের ॥

সাগর পারের প্রথম শহীদ ঃ ধীংগরা

ধীংগরা—রাজভক্তির পল্বলে প্রস্ফুটিত দেশভক্তির এক সুদর্শন পদ্ম, ভোগ বিলাস লালসার নর্দমায় যেন এক আকস্মিক অতিথি এক অজগর সর্প, দেশদ্রোহীদের সমাজে স্বাদেশিকতার এক জ্বলন্ত সূর্য, হিরণ্যকশিপুর ঘরে যেমন বিধাতার আশীর্বাদ প্রহ্লাদ, কংসের কারাগারে যেমন শ্রীকৃষ্ণ – মুখে বাঁশী, হাতে সুদর্শন চক্র। বাংলার অগ্নিশিখা ক্ষুদিরাম-কানাই-সত্যেনের পাশে দাঁড়ালেন ১৭ই আগষ্ট ১৯০৯ এ অমৃতশহরের অগ্নিকিশোর ধীংগরা।

১৯০৯ সনের ১৭ই আগষ্ট তারিখের প্রথম প্রত্যূষে লণ্ডনের পেনটন বিলা জেলের ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে ধীংগরা হাসতে হাসতে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরে ভগবানের নিকট জানালেন প্রার্থনা :

বারে বারে আমি যেন
ভারতে জন্মগ্রহণ করি.
বারে বারে আমি যেন
ভারতের স্বাধীনতার জন্য
এমনি করে মৃত্যু বরণ করি,
যতদিন না হয় ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান।

ধীরে ধীরে ফাঁসির দড়ি নীচে নেমে যায়।

আর তখন স্বদেশ-প্রেমের এক জ্বলন্ত সূর্য অকালে নিভে যায় পাতাল পুরীর অন্ধকারের তলায়। সেদিন ১৭ই আগষ্ট, ১৯০৯।

ধীংগরার বিশ্বাসী সাথী 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর জ্ঞানচাঁদ শর্মা মুণ্ড মোচন করে শহীদ ধীংগরার শ্রাদ্ধাদি কার্য সুসম্পন্ন করেন।

॥ আঠার ॥

ধীংগরার আত্মদান : দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে জনজাগরণ

আটমাস পর নাসিকের জেলে দক্ষিণ ঔরঙ্গাবাদের তরুণ যুবক অনন্ত লক্ষণ কানহারে ১৯১০ সনের ১৯শে এপ্রিল তারিখে শেষ রাত তিনটায় ধীংগরার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ফাঁসি কাঠে প্রাণ দিলেন। নাসিকের অত্যাচারী ম্যাজিষ্ট্রেট জ্যাক্সন গণেশ দামোদর সাভারকরকে লঘু অপরাধে গুরু-দণ্ড দিয়েছিলেন এবং তারই জন্য তাঁকে অনন্ত লক্ষ্মণের পিস্তলের গুলির মুখে প্রাণ দিতে হল—২১শে ডিসেম্বর, ১৯০৯।

অনন্ত লক্ষ্মণের সাথে ফাঁসি কাঠে উঠলেন আরও ছুজন তরুণ যুবক—গোপালকৃষ্ণ করে ও বিনায়ক নারায়ণ দেশপাণ্ডে। তাঁরা হত্যা করেননি। হত্যায় নাকি সহযোগী ছিলেন। জ্যাকসন হত্যার মামলায় আরও তিনজনার দ্বীপান্তর হ'ল। তন্মধ্যে একজন গণেশ দামোদর সাভারকর। গণেশ দামোদর সাভারকর ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ধারায় আপত্তিজনক ভাষণের জন্য ৯ই জুন, ১৯০৯ এ ম্যাজিষ্ট্রেট জ্যাকসনের প্রদত্ত দণ্ডে ভোগ করছিলেন কালাপানি। এ ছাড়া আরও একজনার হয় ছু বছর জেল।

জ্যাকসন হত্যার মামলার রায় দিলেন স্যার এনাজি চন্দ্রভারকর —মার্চ ২৩, ১৯১০।

এবার হয় নাসিক ষড়যন্ত্র মামলার আয়োজন।

এ মামলায় লণ্ডনে বিনায়ক দামোদর সাভারকর বা বীর সাভারকর গ্রেপ্তার হন—মার্চ ১৩, ১৯১০।

নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা সুরু হয়—সেপ্টেম্বর, ১৯১০ : ১২১ দণ্ড-বিধি আইনে মামলা—অভিযোগ ইংল্যাণ্ডাধিপতি ভারত সম্রাটের

বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম। বিচারক স্যার বাসিল স্কট, স্যার এনাজি চন্দ্র ভারকার ও মিঃ হিল। দামোদর মহাদেও চন্দ্রাতা প্রমুখ পয়ত্রিশ জন হন গ্রেপ্তার। এই মামলায় বীর সাভারকরের হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং কেশবচন্দ্র ভাকারকারের হয় পনর বছর দ্বীপান্তর।

আমেদাবাদ (সৌরাষ্ট্রের প্রধান সহর)-এ সস্ত্রীক বড়লাটের গাড়িতে বোমা ফেলার ব্যাপারে সাভারকরের ছোট ভাই ডাঃ নারায়ণ দামোদর সাভারকরের হয় ছ' মাস জেল। এ ছাড়া আরও কয়েকজনার হয় সাত ও পাঁচ বৎসরের দীপান্তর।

দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে আরও বিপ্লবাত্মক কার্যের সন্ধান পায় পুলিশ। গোয়ালিয়র ও সাতারায় বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র এবং আমেদাবাদ (সৌরাষ্ট্র)-এ সস্ত্রীক বড়লাট মিণ্টোর গাড়ির উপর বোমা পড়া ছাড়া মাদ্রাজের নিকটবর্তী তিনেভেল্লির জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ্যাসে নিহত হন—১৭ জুন, ১৯১১।

গোয়ালিয়র ষড়যন্ত্র মামলা :
বিশেষ আদালতে বিচার—
২২ জন দণ্ডিত।

সাতারা ষড়যন্ত্র মামলা (১৯১০)
বোমা তৈরী ও বৈপ্লবিক সাহিত্য প্রচারের অভিযোগ—
দুজন অন্ধ্রবাসী ও একজন কোল্হাপুর বাসী দণ্ডিত।

পুলিশ মহলের ধারণা, এই সব বৈপ্লবিক কার্যকলাপে বীর সাভারকরের হাত ছিল। পরবর্তীকালে রাওলাট রিপোর্টে পুলিশের সন্দেহই স্বীকৃত হয়।

॥ উনিশ ॥

CULT OF MURDER

সাভারকর-ধীংগরা ।

দক্ষিণ পশ্চিম ভারতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে অনুষ্ঠিত বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের আজ্ঞাদাতা বীর সাভারকর। তাঁর গোপন নির্দেশ ছিল বোমা, পিস্তল ব্যবহার ও হত্যার ইঙ্গিত। বীর সাভারকরের নীতিকে তাই বলা হয় Cult of Bomb or Cult of murder অর্থাৎ বোমার নীতি বা হত্যার নীতি। মামলায় যে ভাবে বীর সাভারকরের অপরাধ উপস্থাপিত করা হয় তাতে তাঁর এই Cult of murder বা হত্যানীতি অপরাধমূলক এবং সাধারণ মানুষের নিকট তাহা বিভীষিকা সম্পন্ন বলে বিবেচিত হয় কিন্তু আমরা যদি বীর সাভারকরের প্রকাশিত রচনা—Pistol bullet, O Martyrs ও Six martyrs অর্থাৎ পিস্তল বুলেট, হে শহীদ ও ছয় শহীদ—পড়ি এবং সাগর পারে তাঁর প্রধান সহযোগী ধীংগরার লিখিত বয়ান পড়ি তা হলে আমরা দেখতে পাবো ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পদক্ষেপে সাভারকরের Cult of murder এর প্রয়োগ ছিল অপরিহার্য।

সাভারকরের নীতিকে ইংরাজ রাজপুরুষ, ভারতীয় রাজভক্ত এবং এমন কি অনেক ভারতীয় দেশভক্ত 'সন্ত্রাসবাদ' (Terrorism) আখ্যা দিয়েছেন কিন্তু এরূপ আখ্যা ভুল, উদ্দেশ্যমূলক ও বিভ্রান্তিকর। ধীংগরা তাঁর বয়ানে এ সম্বন্ধে আমাদের দিয়েছেন পরিষ্কার ও যথাযথ ধারণা। রাজনৈতিক হত্যার তাৎপর্য কি? সার্থকতা কোথায়? আসুন আমরা ধীংগরার বয়ান অনুধাবন করি।

ধীংগরার প্রথম কথা প্রতিবাদ—সন্ত্রাস নয়। ভারতপ্রেমিক

ভারতীয় তরুণদের উপর বিদেশী শাসক ইংরাজ ও তাদের 'জো হুকুম' আমাদের অকথ্য অত্যাচারের প্রতিবাদ।

ইংরাজ আমলা ব্লাণ্ট সাহেব তা অনুধাবন করে সেদিন বলেছিলেন—বৃটিশ শাসনে নিশ্চয় কিছু গলদ আছে, আর সে গলদ বৃটিশ শাসকের ষোলআনা স্বার্থবাদিতা। বিলাতে 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা ধীংগরার ঘটনার পর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন—বৃটিশ স্বার্থবাদিতা ত্যাগ না করলে এবং ভারতের স্বাধীনতা ব্যাপারে সভানুভূতি-সম্পন্ন না হলে রাজনৈতিক হত্যা চলবে। তাই আমরা আজ আরব গেরিলা ও ভিয়েতনামী গোরিলার action (কার্য) এ দেখি সন্ত্রাসসৃষ্টি উদ্দেশ্য নয়—উদ্দেশ্য প্রতিবাদ ও প্রতিকার।

রাজনৈতিক বিপ্লবী কর্মকাণ্ড মাত্রকেই ইংরাজ 'যুদ্ধোত্তম' আখ্যা দেন। ইংরাজ ভাল ভাবেই জানেন শক্তি ও সঙ্গতিশালী বৃটিশ শক্তির সাথে সশস্ত্র যুদ্ধ করা পরাধীন অস্ত্রহীন ভারতবাসীর পক্ষে অসম্ভব। তাই এই উদ্দেশ্যমূলক বিভ্রান্তিকর আখ্যা। ধীংগরা তাই তাঁর বয়ানে বলেছেন—ইংরাজ বল প্রয়োগ দ্বারা আমাদের শাসন ও দমন করছেন। শক্তি ও সঙ্গতিশালী বৃটিশ সামরিক-বলকে রুখবার সামর্থ আমাদের নেই। তাঁরা এটাকে মেষ-সুলভ বশ্যতা মনে করে শাসন ও দমন দীর্ঘস্থায়ী করবেন যদি না আমরা এর জবাব দিই—আর সে জবাব পিস্তল। তাই ধীংগরার দ্বিতীয় কথা : জবাব।

ধীংগরার শেষ কথা : আত্মবলিদান মারফত জনজাগরণ সৃষ্টি। আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে আমাদের বিদ্রোহী কবি নজরুল CULT OF MURDER—হত্যানীতি ও ফাঁসির মঞ্চে বিপ্লবীর আত্মদান এর ভবিষ্যৎ সার্থকতার এই রূপকে কল্পনা করেই লিখেছিলেন —

ফাঁসির মঞ্চে কারার বেত্রে ইহারা বুঝি চির কেনা;
ভাবিয়াছ বুঝি শুধিবে না কেহ উৎপীড়নের দেনা।

CULT OF MURDER-এর প্রবক্তা সাভারকর পেলেন বন্দীত্বের অভিশাপ আর সহযোগী ধীংগরা পেলেন মৃত্যুর ছায়া। সাভারকর ইতি পূর্বেই ব্যারিষ্টারি পাশ করেছেন কিন্তু ব্যারিষ্টারি সনদ-দাতা বৃটিশ সংস্থার নিযুক্ত এক বিশেষ কমিটি ঘোষণা করলেন যে সাভারকর যদি মুচলেকা দেন যে তিনি আর রাজনীতি করবেন না তাহলে তাঁকে ব্যারিষ্টারি করবার জন্য সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। সাভারকর মুচলেকা দিতে অস্বীকার করেন—ফলে ব্যারিষ্টারী করা তাঁর ভাগ্যে ঘটে নি। বলা বাহুল্য লণ্ডনে অবস্থিত ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি বৃটিশের দমন-নীতির জন্য দায়ী স্যার কর্জন উইলির হত্যা (জুলাই ১, ১৯০৯) ঘটনাই সরকারের এই বিরূপতার কারণ।

তারপর নাসিকের ম্যাজিষ্ট্রেট এ, এম, টি জ্যাকসন হত্যা (ডিসেম্বর ২১, ১৯০৯), তিনেভেল্লির ম্যাজিষ্ট্রেট এ্যাসে হত্যা এবং আমেদাবাদে বড়লাট লর্ড মিণ্টোর উপর বোমা প্রভৃতি ঘটনার পর যে নাসিক ষড়যন্ত্র মামলার উদ্ভব হয় তাতে বৃটিশের চক্ষুশূল নাসিকের বিপ্লবী বীর সাভারকর যে গ্রেপ্তার হবেন তা আর বিচিত্র কি!

১৯১০ সালের মধ্যভাগে বোম্বাই সরকারের তার-ওয়ারেণ্টের বলে লণ্ডন পুলিস 'ইণ্ডিয়া হাউস' থেকে বীর সাভারকরকে গ্রেপ্তার করেন এবং জাহাজে বন্দী সাভারকরকে ভারতের পথে প্রেরণ করেন (জুলাই ৮, ১৯১০)।

বন্দী সাভারকরকে নিয়ে মোরিয়া জাহাজ ভারতের পথে দিল পাড়ি। বৃটিশ সরকারের সাগর জলের পারে ফ্রান্স রাজ্যের অধীন মার্সেলিস বন্দরে সাভারকরকে মুক্ত করবার এক পরিকল্পনা হ'ল। লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও প্যারিসে শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা ও ম্যাডাম কামার এই পরিকল্পনা।

ফ্রান্সের 'মার্সেলিস' বন্দরে 'মোরিয়া' জাহাজ আসামাত্রই সাভারকর পায়খানায় প্রবেশ করেন এবং পায়খানার পথে জীবনের পরোয়া না করে সমুদ্রের পথে নেমে যান। জাহাজের কর্মচারীরা নৌকায় তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং তাঁকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করেন। বিপদাপদ তুচ্ছ করে সাগরের জলে সাঁতার কেটে সাভারকর নিরাপদে তটে উপনীত হন। অদূরে মোটর নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন মাডাম কামা কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেখানে পৌঁছবার আগেই তিনি ফরাসী পুলিসের হাতে বন্দী হন এবং জাহাজের কর্তৃপক্ষের হাতে প্রত্যর্পিত হন। পৃথিবী ব্যাপি সংবাদপত্র মারফত সাভারকরের এই বীরত্বব্যাঞ্জক কার্য প্রচারিত হয় এবং সাভারকর বীর আখ্যায় ভূষিত হন।

ফরাসীর মাটিতে সাভারকরের গ্রেপ্তার আন্তর্জাতিক আইনের বিরোধী এবং তজ্জন্য শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা হেগস্থ আন্তরাষ্ট্রীয় আদালতে অভিযোগ করেন কিন্তু বৃটিশের কূটনৈতিক প্রভাবে এ অভিযোগ হয় বাতিল। মাডাম কামার চেষ্টায় ফরাসী সরকার বৃটিশ সরকারের কাছে ফরাসীর মাটিতে সাভারকরের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান এবং সাভারকরকে ফরাসী সরকারের হাতে প্রত্যর্পণের দাবী জানান। প্যারিস থেকে মাডাম কামা ভারতে এক বন্ধুর নিকট পাঠালেন তার।

Savarkar arriving Bombay by steamer 'Morea' —Inform him French Government demand his return. See Savarkar's professionally and Choose Solicitors.

অর্থাৎ, সাভারকর মোরিয়া জাহাজে বোম্বাই-এ পৌঁছাচ্ছে। তাঁকে জানাও ফরাসী সরকার তাঁর প্রত্যর্পণ দাবী করছে। সাভারকরের মিত্র ব্যারিষ্টারের সঙ্গে দেখা কর এবং সলিসিটর ঠিক রাখ।

মাডাম কামার এ প্রচেষ্টাও বানচাল হয়।

নাসিক ষড়যন্ত্র মামলায় বীর সাভারকরের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয় ১৯১০ সনের শেষাশেষি। ১৯১১ সাল থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত তিনি আন্দামানে বন্দী-জীবন যাপন করেন। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত তিনি রত্নাগিরিতে নজরবন্দী থাকেন। বীর সাভারকরের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত তিনি হিন্দুসমাজ সংস্কার ও হিন্দুর সৈনিক-শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে প্রচার কার্য চালান এবং চার বৎসর কাল হিন্দুমহাসভার সভাপতি ছিলেন।

ভারতে সাভারকরের প্রধান বিপ্লবকেন্দ্র ছিল নাসিক। অন্যান্য কেন্দ্র—বোম্বাই, পুণা, আমেদাবাদ, অরঙ্গাবাদ, হায়দরাবাদ ও গোয়ালিয়র। ইটালির কার্যপ্রণালী অবলম্বনে তিনি ভারতের মুক্তি আনয়নের প্রচেষ্টা করেন। দীর্ঘ তের বছর আন্দামানে ও দীর্ঘ তের বছর রত্নাগিরিতে তিনি বন্দী জীবন যাপন করেন। ১৯৬৬ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি তারিখে এই মহান বীর বিপ্লবী সাভারকর পরলোক গমন করেন।

১৯৪০ সন—২২শে জুন তারিখে বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বীর সাভারকরের বাড়ীতে গিয়ে দেখা করলে বীর সাভারকারই সুভাষচন্দ্রকে সাগরপারে গিয়ে রাসবিহারী বসুর সংযোগে ভারতীয় সৈনিক সংগঠনের মন্ত্রণা দেন। বীর সাভারকরের মারাঠি ভাষায় লেখা বই 'মাঝি জন্ম থেপ' আন্দামানের অন্ধ কাহিনীকে করেছে নগ্ন। পণ্ডিত পরমানন্দ অসি ও মসী যুদ্ধে বীর সাভারকরকে গুরুদেব বলে মান্য করতেন।

॥ কুড়ি ॥

CULT OF MURDER (হত্যানীতি):

বর্তমান ভারত

শীতের ভোর ছটা।

শুকতারা ডুবন্ত। মাথার উপর আধখানা চাঁদের শেষ রশ্মির ছটা। পাতলা কুয়াসা ভাসছে সাগরের জলে। আকাশের কাল মেঘ কুয়াসায় সাগরের জলের সামিল—মনে হয় জলাভূমির মাঝে মাঝে যেন পর্ণ কুটির।

পূর্ব-দক্ষিণ কোণের আকাশ শেষ শীতের কুয়াসার মধ্যে ধীরে ধীরে নিচ্ছে রক্তাভ লোহিত্য। ছটা কুড়ি—হঠাৎ দেখা যায় সেই লোহিত আভার তলায় সাগর জলে ফুটে উঠল যেন রক্ত রাঙা লাল স্থল-পদ্ম। আশে পাশে লুলিয়াদের পারিজাত কাঠের নৌকা। একটু একটু করে পদ্মের রূপ বদলে যায়।

উপুড় করা ভাঁড়—রক্ত রাঙা লাল—ভাসে যেন সাগর জলের উপর। সেই রক্ত রাঙা লাল উপুড় করা ভাঁড় ধীরে ধীরে হয় বড় ......আরও বড়। অকস্মাৎ সে বিচ্ছিন্ন হয় সাগর জলের সাথে—আকাশে উঠে যায় মস্ত বড় লাল সূর্য। শীতের শেষ রাতের সাগর জলের প্রহেলিকার হয় অবসান।

গত রাত্রির রাত বারটার পর পড়েছে ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ (বাংলা ২৭শে মাঘ, ১৩৭৯)—আমার জন্মদিন। আমার জীবনের পয়ষট্টিটি শীতের অবসান। সুরু হ'ল আমার ছেষট্টি বছরের জীবন কাল। পুরীর সমুদ্র সৈকতের বাসা বাড়ীতে গত রাতে 'সাভারকর ও শহীদ ধীংগরার' পাণ্ডুলিপির উনিশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করে ঘুমিয়ে পড়ি এবং সকালে উঠে দেখছি সাগর জলে সূর্য উঠবার খেলা—

রাত্রি অবসানে দিবসের আবির্ভাব—মৃত্যুর পরপারে জীবনের ইঙ্গিত। পিছনে ফিরে দেখি বাংলা দেশের একখানি ঘরে একমাত্র ভগ্নীর মৃত্যুদৃশ্য—বেলগাছিয়া হাসপাতালের একটি কেবিনে সন্তপ্রসূত একমাত্র শিশু পুত্রের মৃত্যু শয্যায় আমার জীবনের প্রথম স্ত্রী 'কমলা'র অকাল মৃত্যুর দৃশ্য। সামনে তাকিয়ে দেখি শোক-সন্তপ্ত সর্বস্বান্ত জীবনের বালুচর। জীবনের সেই বালুচরে উঠবে না কোন দিন এই প্রভাতের এই সূর্য। আজও আমার জিজ্ঞাসা—মৃত্যুর পরপারে আছে কি জীবন? সেই যদি জীবন হয় সেই জীবনের বৃক্ষ শাখায় মিলবে কি সব ছিন্ন পত্র? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর আজও কেউ দেন নি।

কিন্তু যে বোনটি আমার সামনে চারঘণ্টা ধরে "দাদা দাদা' বলে ঘুমিয়ে পড়ল তার স্মৃতি যে জ্বালাময়ী—অসহায়ত্বের জ্বালা, যে পত্নী শিশু পুত্র নিয়ে ঘরে ফিরে সংসার করবার ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল তার স্মৃতি যে মারাত্মক—মৃত্যুরই সামিল। তাই ত আমার এই ছেষট্টি বছরের জন্মদিন—মৃত্যুদিন। শহীদের মৃত্যু কাহিনীর মধ্যে আমার মৃত্যুর সামিল জন্মদিনগুলো সার্থকতার রূপ-রসে মণ্ডিত এবং নিত্য বাঁচা ও নিত্য মরার গানে মুখর।

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে ভারতীয় বিপ্লব আন্দোলনে শত শহীদের কণ্ঠে ছিল এই নিত্য মরা ও নিত্য বাঁচার গান। সে যুগে CULT OF MURDER বা হত্যানীতির মূল্য ছিল অনবদ্য। প্রয়োজন সামগ্রিক—দেশ ও দেশবাসীর উপর অত্যাচারী দুষমনদের মৃত্যুদণ্ড; আবেদন মহান ও শুদ্ধ—নিঃস্বার্থ আত্মদান মারফত জনজাগরণ সৃষ্টি।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর মহাত্মা গান্ধী যখন ভারতের অহিংস মুক্তি সংগ্রামের নায়কত্ব গ্রহণ করলেন তখনও মারাঠা-বাংলা-পাঞ্জাবের শত শহীদের রক্তে রাঙা এই জনজাগরণ ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষে ছিল বিরাট এক মূলধন।

অনেকের কাছে আজ প্রশ্ন ভারতীয় বিপ্লববাদ ও CULT OF MURDER বা হত্যানীতি কি ভারতের স্বাধীনতা এনেছে?

এর সহজ ও সরল উত্তর হল—না।

কিন্তু এই উত্তর সব নয়। আমরা স্বীকার করতে বাধ্য ভারতীয় বিপ্লববাদ ও CULT OF MURDER ভারতের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব করেছে।

কারণ—

ভারতীয় বিপ্লববাদও CULT OF MURDER-এ বিশ্বাসী শহীদদের আত্মদান পরাধীনতায় মশগুল ভারতীয়দের প্রাণে সৃষ্টি করেছিল মহান জনজাগরণ ও অনবদ্য প্রেরণা—যা ভারতের স্বাধীনতা-অর্জনের পক্ষে ছিল বিরাট এক মূলধন।

তাই বলে এটাও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য নই যে মহাত্মা গান্ধীর শুধু মাত্র অহিংস সংগ্রামে (আগষ্ট আন্দোলন, ১৯৪২) ভারতের স্বাধীনতা এসেছে।

গান্ধীজীর মূল কথা ছিল ভারতবাসী নিরস্ত্র। সশস্ত্র ইংরাজের কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে হলে দরকার অহিংস সংগ্রাম কিন্তু তাঁর এই অহিংস সংগ্রামের মধ্যে হ'ল সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব। যিনি ভারতীয় বিপ্লববাদ ও CULT OF MURDER-এর মূল্য অনুধাবন করে বললেন:

ইংরাজ ছলে বলে কৌশলে আমাদের দেশ ভারতবর্ষ দখল করেছে—আমাদের ছলে বলে কৌশলে আমাদের মাতৃভূমির উদ্ধার সাধন বাঞ্ছনীয়। হিংসা অহিংসা প্রশ্ন নয়—প্রশ্ন দেশোদ্ধার।

ভারতীয় বিপ্লববাদের ইতিহাসে সিপাহীবিদ্রোহ, গদর বিপ্লব, রাসবিহারী বসুর যুদ্ধোদ্যম, বাঘা যতীনের বালেশ্বর যুদ্ধ, সূর্য সেনের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অধিকার ও বহু খণ্ড যুদ্ধ সুভাষচন্দ্রের চোখে জ্বেলেছিল সশস্ত্র যুদ্ধোদ্যমের এক জ্বলন্ত প্রতিভা—যা দ্বিতীয় বিশ্ব-

যুদ্ধে আজাদহিন্দ ফৌজ গঠনে ও দিল্লী চলো অভিযানে নিয়েছিল সার্থক রূপ।

গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন 'আগষ্ট আন্দোলন ১৯৪২' ও 'ভারত ছাড় আন্দোলন, ১৯৪২' এ শত শত শহীদের রক্ত দান এবং সুভাষচন্দ্রের সশস্ত্র আজাদ হিন্দ ফৌজের রক্তাক্ত 'দিল্লী অভিযান'-এর হিংস রণোদ্যম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতি ইংরাজকে ভারত ত্যাগে ও ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য করেছিল।

ভারতের এই বন্ধন-মুক্তির ইতিহাসে ভারতীয় বিপ্লববাদ ও CULT OF MURDER এর সার্থক দান হ'ল জন জাগরণ, আত্ম-দানের প্রেরণা ও যুদ্ধোদ্যমের পরিকল্পনা। ভারতের বিপ্লববাদের এই বিরাটত্বের সামিল হ'তে পারি নি স্বাধীনতোত্তর বৈপ্লবিক দলগুলি।

কেন?

কারণ—এই দলগুলির আদর্শ ও কর্মপন্থার পিছনে ছিল লেনিন কিংবা মাও কিংবা লোহিয়ার দর্শন। লেনিনের রাশিয়া এবং মাও-এর চীন বিপ্লবকালে যে পরিবেশ, পরিস্থিতি ও গণ সংগঠন সমস্যার অধিকারী ছিল তা এখন পরিবর্ত্তিত।

দ্বিতীয়তঃ, বর্তমানকালীন পরিবেশ, পরিস্থিতি ও গণ সংগঠন সমস্যা যে ভিন্ন তা অনুধাবন না করেই রাশিয়া ও চীন বিপ্লবের মত বিপ্লব ভারতে আমদানী করতে এই সব দলগুলি প্রয়াসী হয়।

তৃতীয়তঃ, কোন লাইনে জোট বাঁধলে এবং কাজ করলে ভারতে শ্রেণী দ্বন্দ্ব-বিপ্লবের পথ তৈরী হ'তে পারে এই সব দলগুলি তা আবিষ্কারে প্রয়াসী হয়নি।

চতুর্থতঃ, দল সম্প্রসারণ, অগ্রাসন ও গ্রাসনীতির ফলে তথা-কথিত শ্রেণী দ্বন্দ্ব বিপ্লব মাঠে মারা যায় এবং তাহা দলাদলি হানাহানি খুনোখুনিতে পর্যবসিত হয় (১৯৬৯-৭১)।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, এ সংগ্রাম যদি সত্যি সত্যি ধনতন্ত্র, শোষণ ও কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে হ'ত তাহলে ঐক্যবদ্ধ হ'ল না কেন? হল না কেন কর্মপদ্ধতি ধারায় একই স্বীকৃতি। উদ্দেশ্য যদি সাধু ও নিঃস্বার্থ হ'ত, মনোভাব যদি মধ্যবিত্ত সুলভ আধা-এরিষ্টক্র্যাট না হয়ে যদি শ্রেণীত্যাগী ও সর্বহারাদের সাথে একতাবোধে নিষ্ঠাবান হ'ত তা হলে আর কিছু না হ'ক এমনটি হ'ত না—রাজনীতির নামে খুনোখুনি হ'ত না। একে ভারতীয় বিবপ্লবাদের CULT OF MURDER-এর সামিল বলা চলে না। লেনিন-মাও হবার সখ-মাখা নেতৃত্বের বিলাস, হামবড়া তারুণ্যের কর্মশক্তির ছেলেখেলা ছাড়া এ আর কোন ছাপ রেখে যেতে পারেনি।

বিপ্লবের মরা গাঙে তাই আজও ভাসছে মস্তানী মেজাজের শ্যাওলা। এই ছাপ ছাড়া আরও একটি ছাপ রেখে গেছে ১৯৬৯-৭১ এর অপবিপ্লব যা এখনও অর্থপূর্ণ। উপদ্রুত অঞ্চলের রাস্তার মোড়ে মোড়ে স্মৃতি ফলকে লেখা কত কিশোরের নাম। অপবিপ্লবের হতভাগ্য বলি। পার্টিবাজি, মস্তানি মেজাজ, আঞ্চলিক আধিপত্যের হাঙ্গামার শিকার। ঠুনকো সামান্য সন্ত্রাসনীতির হাতে ভারতীয় বিপ্লববাদের বিরাটত্বের অপচয়।

অপবিপ্লবের হতভাগ্য বলি হাজার হাজার কিশোর শহীদ, আমি তোমাদের কাছে পৌছে দিচ্ছি নূতন খবর। তোমাদের শ্লোগান—ধনতন্ত্র, শোষণ ও কায়েমি স্বার্থের বিরোধী আওয়াজ আজও আমাদের কানে বেজে ওঠে আমাদের নূতন আশায় নাচিয়ে তোলে। তোমাদের সে সব আওয়াজ গ্রহণ করেছে ইন্দিরার নয়া সমাজতন্ত্রবাদ।

তোমাদের আওয়াজে রক্তাক্ত বিপ্লবের সম্ভাবনা উপলব্ধি করেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। তাঁর নব-কংগ্রেস ও তার ছাত্র সংগঠন ছাত্রপরিষদ ও যুব সংগঠন যুব কংগ্রেস এর সম্মুখে আজ চরম

পরীক্ষা। আগামী পাঁচ বছরে (১৯৭২-৭৭) এদের আসন অক্ষুণ্ণ থাকলেও তোমাদের আওয়াজ তাতে নিত্য দিবে নাড়া।

অপবিপ্লবের হাজার হাজার কিশোর শহীদ শোনো—আরও নূতন খবর। ইন্দিরার নব-কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী নেই কিন্তু আছে অন্তর্দ্বন্দ্ব। অন্তর্দ্বন্দ্ব দ্বিবিধ—এক উপদলীয় কোন্দল, দুই সমর্থকদের স্বার্থবাদ ও নিষ্ঠাহীনতা। শেষোক্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব ভারতবর্ষের জাতীয় স্বার্থের—এমন কি স্বাধীনতার পক্ষেও মারাত্মক ভাবে ক্ষতিকর এবং ইন্দিরার নয়া-সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিমূর্তিকে নষ্ট করতে পারে। এদের মধ্যে আছে সেই ধনিক, সেই শোষক, সেই কায়েমি স্বার্থবিশিষ্ট হোমরা চোমরা ব্যক্তিগণ যাদের বিরুদ্ধে তোমরা তুলেছিলে আওয়াজ একদিন। এদের সম্পর্কে ইন্দিরার শাসনযন্ত্র নিশ্চয়ই অবহিত আছেন। যার প্রত্যক্ষ নমুনা সাম্প্রতিক কয়লাখনির জাতীয়করণ (জানুয়ারি ৩০, ১৯৭৩)।

তোমাদের নিশ্চয়ই জানা ছিল শিল্প-জাতীয়করণ হলে শ্রমিক ও সরকার সংগ্রামের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে এবং শ্রেণীদ্বন্দ্ব বিপ্লবের পথ হয় সুগম। এই নিষ্ঠাহীন স্বার্থবাদীদের মধ্যে আছে আর এক শ্রেণী—সাধারণ লোক কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে রাজনীতির বালুচরে খুঁজে বেড়ান চক্‌চকে মণি মুক্তা। আবার অনেকের ঘাড়ে চেপেছে সি, আই, এ—মার্কিন স্পাই যারা আজ ছেয়ে ফেলেছে ভারতের সমস্ত সীমান্ত শহর ও সাগর উপকূলস্থ নগরী এবং রাজধানী শহর। এ সব জায়গায় বেড়াতে গেলে দেখা যাবে দলে দলে ঘুরছে লাল মুখো কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতী। কোথাও বা সাধু সন্ন্যাসী সেজে তারা ঘুরছে মঠ ও মন্দিরে—কোথাও বা সাড়ি ধুতি পরে বাঙালী হয়ে ঘোরা-ফেরা করছে—আবার কোথাও বা মাথা মুণ্ডন করে টিকি রেখে হয়েছে বোষ্টম। লোক-পরম্পরায় শোনা যায় ভারতে অবস্থিত বৃটিশ, মার্কিন ফার্ম, ক্রীশ্চান

মিশন ও অন্যান্য সংগঠন মারফত এদের অর্থাদি সরবরাহ করেন।

আমাদের দেশে ভদ্র-অভদ্র বেশ কিছু সংখ্যক লোক আছেন যাদের দেশপ্রেমের কোন বালাই নেই! শুনে অবাক হই যখন ট্রেনে-বাসে ভদ্রবেশধারী লোকরা রেশন কমবার কারণ তুলে বলেন, এবার হয় রুশ নয় মার্কিন হবেন প্রভু। এ হেন দেশে লালমুখো কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতী যথেষ্ট গোপন গাইড পাবে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ আছে বলে আমাদের মনে হয় না। তা ছাড়া যখন আকর্ষণীয় বস্তু আছে—অকাতর অর্থ, দ্বিধাহীন নারীদেহ।

শোনা কথা। চোখে দেখায় আর কতটুকু জানা যায়। তবে হিপি রহস্য কারো অবিদিত নয়। তাই যদি হয় তবে ভারতের সামরিক অসামরিক গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর ফটো ও তথ্য সাগর পারে গিয়ে হচ্চে জমা। নিকসন কি তার টংকিং উপসাগরের-জলে ভিয়েত নামের রক্তে রাঙা হাত ধুয়ে প্রসারিত করছেন সন্থ সাদা হাতখানা ভারতের দিকে। গত অপবিপ্লবের শহীদগণ, তোমরা আমাদের দেওয়ালে দেওয়ালে লিখতে একদিন—বাংলাদেশের অপর নাম······ ভিয়েতনাম। তোমাদের সে স্বপ্নে দেখা ভিয়েতনাম আজ বিজয়ী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জড় করা বোমা মেরেও গণতন্ত্র ও শান্তির মুখোশ পরা মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ভিয়েতনামকে জব্দ করতে পারেন নি। কারণ ভিয়েতনামের ছিল একটি বোমা আর সে বোমা হল অটুট দেশপ্রেম। দেওয়ালের লিখন যদি তোমাদের অন্তরের কথা হয়ে থাকে তা হ'লে তোমাদের রক্তের আত্মীয়গণ যথা স্থানে যথা সময়ে সেই ভিয়েতনামী বোমার প্রয়োগ করবে।

কিশোর শহীদ বন্ধুগণ, রক্তের শয্যায় হঠাৎ চমকে উঠছ কেন? অন্ধ্রের আগুন, আসামের গণ্ডগোল। অন্ধ্র চায় পৃথক রাষ্ট্র, আসাম চায় আসামী ভাষা। মূল কারণ—অর্থনৈতিক·· চাকরি, চাকরি! এই উত্তেজনার মূল কারণ কি সি, আই, এ-র উসকানি? থাকতে

পারে—অসম্ভব নয়। নয়া-সমাজতন্ত্রবাদী সরকার নিশ্চয়ই এ বিষয়ে অবহিত থাকবেন। তোমরা ঘুমিয়ে পড়।

ঐ শোন এলাহাবাদ জেলে ফাঁসির শহীদ কাকোরী বিপ্লবী ঠাকুর রোশন সিং ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমাদের তোমাদের জন্য যে বাণী রেখে গেছেন শোন, সেই বাণী—তারপর ঘুমিয়ে পড়। ঠাকুর রোশন সিং বলেছেন :

পন্থাকে বিচার করতে গিয়ে দেশসেবা যে ত্যাগ করে, সে মুর্খ। পন্থা বড় নয়—দেশ বড়।.........

ঘুম আসে না ?

না আসবারই কথা। একমাত্র সম্বল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বাণী :

একমাত্র শহীদের শোণিতে আদর্শের বীজ উপ্তপ্ত হয়।

বিপ্লবের পৃষ্ঠাঘাত করে ধনতন্ত্র, কায়েমি স্বার্থ ও স্বার্থবাদ। বিপ্লবের অভ্যন্তরে থেকে স্বার্থবাদী বিপ্লবী নামধারী ব্যক্তিগণ ঐ আহত বিপ্লবকে করেন অপবিপ্লবে পরিণত। এমন এক অপবিপ্লবের শহীদ তোমরা—পরলোকগত কিশোর বন্ধুগণ—অপমৃত্যুর জন্য দুঃখ করো না। তোমাদের কার্যে যা কিছুই থাকুক না কেন তাতে যদি বিপ্লব অথবা পরিবর্তনের কোন গন্ধ থাকে তা হ'লে তোমাদের প্রাণদান ব্যর্থ যাবে না—তোমাদের শোণিতে সেই বিপ্লব বা পরিবর্তন সাধনের আদর্শের বীজ নিশ্চয়ই উপ্ত হয়ে থাকবে এবং তা নিশ্চয়ই ফলপ্রসূ হবে—একদিন না একদিন।
